সুপুরিবনের সারি

সুপুরিবনের সারি

অরুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৭০

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
প্রবীর সেন
মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৯

খুদে সম্পাদক শ্রীমান্ আত্মদীপকে

সুপুরিবনের সারি

১

ঝগ্-ঝগ্ ঝগ্-ঝগ্ জল কাটতে কাটতে এগিয়ে চলেছে স্টিমার, দোতলায় ডেকের ওপর রেলিং ধরে তাকিয়ে আছে নীলু। নিচের তলায় মস্ত একটা ঢাকনা-দেওয়া চাকাটা যেখানে, নীলু দাঁড়িয়েছে তার ওপর-দিকটায়। ঝুঁকে তাকালেই চোখে পড়ে অনেক কালোর মধ্যে শাদা শাদা ফেনায় ভরা জল, শাদাকালো ঢেউ তুলতে তুলতে মিলিয়ে যাচ্ছে পাড়ের অন্ধকারে। সেখানে ঝাপসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘন গাছের সারি।

পুজোর ছুটিতে বাড়িতে চলেছে নীলু, প্রতি বছরই যেমন যায়। প্রতিবারের থেকে এবার অবশ্য আলাদা লাগছে অনেকটা. এবারকার যাওয়ার মধ্যে যেন তেমন কোনো হৈ হৈ নেই কোথাও। প্রতিবার বাড়ি থেকে ফিরবার পথে তারা মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনেরা সবাই মিলে গুনতে শুরু করে আবার কবে বাড়ি আসবে তারা, কদিন আর বাকি। আর তিনশো পঁয়ত্রিশ দিন, তিনশো চৌত্রিশ, তেত্রিশ, বত্রিশ —এমনি করে গুনতে গুনতে কদিনের মধ্যে এ খেলাটা থেমে যায় একদিন, কিন্তু তবু ভাবনাটা মাঝে মাঝেই ঝলকে ওঠে হঠাৎ : কবে যাব রে বাড়ি ? দেখি তো ক্যালেণ্ডারে, কতদিন আর বাকি।

কিন্তু এবার এসব কথা হবে আর কার সঙ্গে ? এবার নীলু একাই যাচ্ছে তার মা বড়োমামা আর বড়োমামির দলে। মেজোমামারা

আসবে না এবার, ছোটোমামাও না, ফুলমামা তো অনেকদিন ধরেই বাড়ির মুখ দেখে না। আসবে না ছোটোদের একজনও, তাদের দাবি মানেনি কেউ, বড়োমামাও না। বাবাকে রাজি করিয়ে কেমনভাবে নীলু এবার একাই একেশ্বর। এ-রকম একেশ্বর হতে মোটেই ভালো লাগে না তার। অনেকদিন পরে সবার সঙ্গে দেখা হলে সবাই মিলে হট্টগোলের ফুর্তি, চারদিকে পিঁড়ি পেতে একসঙ্গে পঁচিশ-তিরিশজনে মিলে খাওয়া, পুজোর-প্রসাদ-ভরা মস্ত বারকোশের চারপাশে গোল হয়ে সবাই মিলে দিদিমাকে ঘিরে ধরা, এসব যদি না-ই রইল, তবে আর বাড়ি যাবার মজা রইল কোথায়!

যাবে না কেউ এবার. কেননা দেশ না কি এবার ভাগ হয়ে গেছে। নীলুদের গ্রামটা না কি এখন অন্য একটা দেশ। ভারি আজব কথা। এখন না কি তাই ভিন্ন কোথাও থাকতে হবে তাদের। কোথায়? তা কেউ ঠিক জানে না এখনো। সেজোমামা আছে ওখানে, বড়োমামা যাচ্ছে, কথা হবে দাদুর সঙ্গে, কথা হবে এই নিয়ে। বড়োমামাদের কথা শুনে বুঝে নিয়েছে নীলু, এবার তারা দেশে যাচ্ছে. আর কোনোদিন দেশে না যাবার জন্য।

ডেকের ওপর সারি সারি সতরঞ্চি মাদুর ফেলে বিছানা করা আছে, গায়ে গায়ে লোক শুয়ে, মাথার দিকে পায়ের দিকে বাক্সপুঁটুলির ভিড়, ওরই মধ্যে একজায়গায় পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে মায়েরা। নীলুর জায়গাটা পড়ে আছে ফাঁকা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে বলে সে এসে দাঁড়িয়েছে এই রেলিং ধরে, জলের দিকে ঝুঁকে তার মুখ। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া সেই মুখের ওপর শিরশিরানি বুলিয়ে দিয়ে যায়!

ডেকটা যেন একটা কচ্ছপের পিঠের মতো, মনে হয় নীলুর। তার যেখানটায় একটু ঢালুমতো নেমে-আসা, দাঁড়াতে তো হয় সেইখানেই! প্রথম-প্রথম ওখানে দাঁড়ালে নীলুর পায়ের তলায় কেমন ছম্‌ছম্‌ করত,

যেন পায়ের তলায় নেই কিছু, এমন একটা ভাব। এখনো যে তা একেবারে হয় না তা নয়, তবে এখন তো নীলু বড়ো হয়েছে অনেক, চোদ্দ বছর বয়েস হলো, এখন তো আর ভয় করলে চলবে না! পায়ের পাতা দুটো ডেকের ওপর শক্ত করে চেপে দাঁড়িয়ে রইল নীলু।

রাত্রিবেলা স্টিমারের ওপর সবাই যখন ঘুমোয়, ভারি অন্যরকম একটা শব্দ শোনা যায় তখন। একদিকে এই জলে-ভেজা ঝগ্-ঝগ্ ঝগ্-ঝগ্ চাকার শব্দ, সব লোকের সব কথা থেমে যাবার পর থরে থরে শুধু নিশ্বাসের শব্দ, বিন্-বিন্ বিন্-বিন্ করে মাথার ওপর খাঁচাবন্দী পাখা-ঘোরার একটানা শব্দ, বয়লারে কয়লা ফেলার শব্দ, এমন-কী যেন আগুনেরও শব্দ। জল হাওয়া আগুন সবকিছুর শব্দ একত্র মিলে গিয়ে নীলুর কানে প্রায় মধ্যরাতের গানের মতো গুন্‌গুন্ করতে থাকে সব, সেইটে শোনার জন্য তার একলা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে বেশ।

ঝুপ্ করে একটা শব্দ হলো জলে। ওপরে সারেঙের ঘর থেকে কিছু যেন ছুঁড়ে ফেলল কেউ। এ-শব্দটা অবশ্য আরেকরকম, মেলে না কিছুর সঙ্গে।

যেখান থেকে ওই শব্দটা উঠেছিল, সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীলুর মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার এইরকম এক ঝুপ্-শব্দের কথা। সেটা ছিল অবশ্য ভোর-রাত। তখন সে একাই নয়, জেগে ছিল ডেকের ওপর আরো অনেকে। তাছাড়া, সেবার যাওয়া হচ্ছিল তো সবাই মিলে, ভাইবোনেরা সবাই, মামা-মামিরা সবাই, সে মস্ত একটা হট্টগোলের দল।

সব যে ভালো মনে পড়ে তাও নয়। অনেকদিনের কথা। মনে পড়ে, 'ওই-যে, ওই-যে, ধরো, পাকড়ো, কীধার গিয়া' এইরকম নানা শব্দের হঠাৎ-জাগা রোল, দুপ্‌দাপ্ আওয়াজ, সিঁড়ি বেয়ে অনেক লোকের

দৌড়ঝাঁপের হল্লা। চোখের সামনে নীলু দেখে, গায়ে ভারী চাদর জড়ানো লম্বা মতন একজন পাজামাপরা লোক, উশকোখুশকো চুল, একমুখ দাড়ি, ছুটে উঠল ডেকে, উঠেই দিশেহারা দৌড়োতে দৌড়োতে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে সারেঙের ঘরের দিকে, ওপরে। শীত তো পড়েনি এখনো, চাদর কেন? মনে হয়েছিল তার। পিছনে পিছনে তাকে ধাওয়া করেছে অনেক লোক, তার মধ্যে কজনের দিকে তাকিয়ে বোঝাই যায় পুলিশ। স্টিমারের মধ্যে পুলিশ তাড়া করছে চোরকে? ডাকাতকে? কোথা থেকে এল পুলিশ? আগে যাদের ঘুম ভাঙেনি, তারাও উঠে বসেছে ততক্ষণে, অনেকেই আছে দাঁড়িয়ে। রেলিং-এর দিকে ছুটে এসেছে অনেকে, যেখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল নীলু, তার মায়ের সঙ্গে।

এমন সময়ে সেই শব্দটা হলো: ঝুপ্, ঝপাস্। কী হলো, কী হলো? রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল সবাই। চাদরজড়ানো ওই লোকটা ঝাঁপ দিয়েছে জলে, আর তার পিছনে-পিছনে আরো ঝপাস্ ঝপাস্, আরো কজনের ঝাঁপ।

স্টিমার চলছেই, চলছেই। মুখ বাড়িয়ে দেখা যায় ওই লোকটা ডুব-সাঁতার দিতে দিতে এগিয়ে গেছে অনেক, পিছনের লোকেরা তাকে ধরতে পারবে বলে মনে হয় না আর। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নীলু দেখে নিশ্চিন্ত হলো যে ছোটো একটা স্টিমবোট ছুটে চলেছে ওই দিকে, ডাকাত এবার ধরা পড়বে নিশ্চয়। মায়ের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে নীলু বলে: 'ভয় নেই, ধরে ফেলবে, পালাতে পারবে না।'

মা একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে ফিরে গেল তার জায়গায়। নীলুও গিয়ে বসল তাদের জমায়েতে। ধরতে পারবে কি পারবে না, এই নিয়ে শুধু কথা। কেউ বলছে: 'লোকটার সাহস আছে বল্? ওই তিনতলা থেকে নদীর জলে ঝাঁপ? আর কী ঢেউ! বড়ো

কোনো সাঁতারুই হবে বোধহয়, না?'

বড়োমামা ফিরে এল দূরের জটলা থেকে। মা জিজ্ঞেস করল: 'ধরে ফেলেছে?' বড়োমামা বলল: 'বোঝা গেল না ঠিক, আড়াল হয়ে গেল তো। তবে স্টিমবোট নামিয়ে দিয়েছে, ধরেই ফেলবে নিশ্চয়।' মা বলল: 'দুর্গা দুর্গা। না-যেন পড়ে ধরা!'

নীলুরা সবাই সেটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। কেন, মা কেন ডাকাতদের হয়ে দুর্গানাম জপ করছে? 'কেন ধরা পড়বে না পিসি?' জিজ্ঞেস করে রঞ্জুদা: 'ডাকাত যদি ধরা না পড়ে, সেটা কি ভালো?'

মা অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে ছিল রঞ্জুদার মুখে। মস্ত একটা শ্বাস ফেলে বলেছিল তারপর: 'ডাকাত-যে, তা জানলি কেমন করে?'

'বাঃ! নইলে পুলিশ তাড়া করবে কেন?'

'পুলিশ কি শুধু ডাকাতদেরই তাড়া করে? জানিস না পুলিশরা আরো কী করে?'

বড়োমামি বলে: 'থাক্ ঠাকুরঝি, এসব কথায় কাজ নেই আর।'

'কেন, কাজ নেই কেন। একটু তো ওদের জানাই ভালো। ওরাও তো বড়ো হবে, জানতে তো হবে।'

নীলু বলেছিল: 'কী জানব মা? কী জানার কথা?'

মা বলেছিল, রঞ্জুদারই দিকে তাকিয়ে: 'ওরা ডাকাত না, ভালো লোক ওরা, ওরা দেশের কাজ করে।'

'সেইজন্যে পুলিশ ওদের তাড়া করে?'

'হ্যাঁ, সেইজন্যে ইংরেজদের সঙ্গে ওদের লড়াই। সে তো আমাদের—এই আমাদের সবারই জন্যে?'

'কিন্তু'—এবার নীলু বলে অবাক হয়ে—'ওরা তো মা ইংরেজ নয়। ওই যারা তাড়া করেছিল, তারা তো সবাই কালো-কালো।'

'কালো-কালোই তারা। তারাও আমাদের দেশেরই লোক। কিন্তু

ওইরকম হয়, ওরাই ইংরেজদের হয়ে কাজ করে।'

একটু দূর থেকে বড়োমামা বলে : 'ব্যস ব্যস অনেক হয়েছে, এবার থাম্ খুকি। কে কোথায় কী শুনবে তার ঠিক নেই। আর, ওই তো, বলছেও তো ওরা, ধরা পড়ে গেছে।'

'ধরা পড়ে গেছে?' কেমন একটা ছায়ায় ছায়ায় ঢেকে যায় মায়ের গোটা মুখটা।

তারপর তো কেটে গেল কত বছর। এখন নীলু বুঝতে পারে কাদের কাদের তাড়া করে পুলিশ ; কিন্তু এখন তো আর সমস্যা নেই কিছু। দেশ এখন স্বাধীন হয়ে গেছে। এখন আর ইংরেজ থাকবে না, এখন কেবল আমরা। কিন্তু তবু এবার বাড়ি যাবার সময়ে মন ভালো লাগে না কেন? তবু এবার সবাই মিলে যাওয়া হলো না কেন? সবারই মনে কেন একটা ভয়-ভয় ভাব?

ভাবতে ভাবতে নীলু ফিরে আসে তার শোবার জায়গায়। বিন্-বিন্ বিন্-বিন্ করে পাখাগুলি ঘুরছেই ওপরে। নিশ্বাসের শব্দে শব্দে উঠছে-নামছে সবার বুক। শুয়ে পড়ে নীলু। ওই নিশ্বাসের শব্দের সঙ্গে মেলানো জলহাওয়াআগুনের শব্দ শুনতে শুনতে নীলু ঘুমিয়ে পড়ল শেষ রাত্রে। অন্ধকার কেটে কেটে স্টিমার চলেইছে সমানে।

২

'এই, ওঠ্। ওঠ্-ওঠ্। এসে গেছি আমরা। এসে গেছে হুলার হাট।'

বড়োমামির ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যায় নীলুর। এসে গেছে? হ্যাঁ, ওই তো শোনা যায় নোঙর করার ঘড়র্ ঘটাং ঘড়র্-ঘটাং। তাড়াতাড়ি উঠে নীলু দেখে যে তার সতরঞ্চিটুকু ছাড়া আর সব গুছিয়ে নেওয়া শেষ। এখানে যারা নামবে, একতলার সিঁড়ির দিকে তারা এগোতে শুরু করেছে আর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠতে শুরু করেছে কুলিরা। হ্যাঁ, এসে গেছে তবে হুলার হাট। এখানে নেমে এবার তাদের নৌকো নিতে হবে। বাকি লোকদের নিয়ে স্টিমার চলে যাবে বরিশাল শহরে।

মজার লাগে না এই নামটা? হুলার হাট। আগে এক সময়ে মনে হতো নীলুর, এখানে নামলেই যেন গণ্ডায় গণ্ডায় রোমফোলানো হুলো বেড়াল দৌড়ে বেড়াবে এধার থেকে ওধার। হয়তো-বা হাট বসবে তাদের নিয়ে। একটাও বেড়াল যদিও দেখেনি কোনোদিন।

অবশ্য থেকেইছে বা কতক্ষণ! এখানে নামবার পর তো বড়োরা সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় নৌকোর দরদাম করতে, মায়েদের সঙ্গে মালপত্রের স্তূপ নিয়ে বসে থাকে ছোটোরা। সামনে কুলিদের আর কুলি সামলানোর জন্য বেতহাতে পুলিশদের দৌড়োদৌড়ি, পিছনে দড়মার বেড়া দেওয়া ছিমছাম কয়েকটা হোটেল। দেশ থেকে ফিরবার পথে ওই হোটেলে একবার খেতেও বসেছিল তারা। মাটিতে চারদিকে চাটাইয়ের আসন

পাতা, সামনে গরম ভাতের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাওয়া মাটির গন্ধ, গরম মুশুরির ডাল দিয়ে ভাত মেখে হাপুস-হুপুস মুখে দিতে কী আরামই-না লাগছিল তখন! কিন্তু ঠিক যখন মাছ দেবে পাতে, তখনি বেজে উঠল স্টিমারের ভোঁ। স্টিমার ছেড়ে দেয় ভেবে খাওয়া ছেড়ে দৌড় লাগায় সবাই, তাদের সেই তাড়ায় আরো বেশি তাড়া লাগায় হোটেলেরই লোকেরা। দৌড়ে গিয়ে স্টিমারে উঠবার পরে কিন্তু জানা যায় যে ছাড়তে তখনো দেরি আছে বিস্তর। আহা, মাঝখান থেকে ওই ইলিশ মাছের বড়ো বড়ো টুকরোগুলি রয়ে গেল সেই হোটেলেই!

নৌকো দর করে ফিরে এল বড়োমামা। বলল : 'যাক, ভালো হলো, চেনা মাঝিই পাওয়া গেল একজন।'

'কার নৌকো পেলে দাদা?'

'রহমত।'

'রহমত? বাঁচা গেল। বুকের দুরদুরানি যায় না কিছুতে। এতবার এতদিন আসি-যাই, কিন্তু এবার যেন পদে-পদে ভয়।'

'আহা অত ভয়ের কী আছে?'

'নেই হয়তো। তবু— । চেনা মাঝি সঙ্গে থাকলে ওরই মধ্যে একটু শান্তি।'

নৌকো চলেছে নদী বেয়ে। হাল ধরে আছে বুড়ো রহমত, বৈঠা টানছে তার দুই ছেলে ইয়াকুব আর ইয়াসিন। নৌকো বেশ বড়োই। পাটাতনের দিকে তাকালে নীলুর মনে হয় চওড়া একটা ইলিশ মাছের মতো। বসে থাকলে মাথা ঘুরবে বলে ছইয়ের ভিতরে বড়োমামিদের বিছানা পাতা হয়ে গেছে আবার। শুয়ে আছে মা আর বড়োমামি, কথা বলছে গুন্‌গুন্ গুন্‌গুন্। দু-একবার তাদের মুখে 'প্রমীলা প্রমীলা' শুনে নীলু বোঝে যে ফুলমামিকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছে ওরা। ফুলমামি নাকি

পাগল হয়ে গেছে, সবাই বলে। নীলু মনে করবার চেষ্টা করে ফুলমামির পুরোনো কথাগুলি, কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না যে সেই ফুলমামি কখনো পাগল হতে পারে। গিয়ে এবার পরীক্ষা করে দেখবে, সত্যি বলে কি না সবাই। আচ্ছা, কাকে বলে পাগল? আর, যদিই-বা হয়ে যায় পাগল, তবে কি আর কবিতা লিখবে না ফুলমামি? তার কাছে বসে এক সময়ে কতজনের কত যে কবিতা পড়েছিল নীলু, সেসব কি আর পড়বে না কোনোদিনও?

গলুইয়ের ওপর বসে আছে বড়োমামা, হাঁটু দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করে হাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে। তাকিয়ে আছে সরে-সরে-যাওয়া পাড়ের দিকে। আর নীলু, কিছুক্ষণ জলের গায়ে পা ছুঁইয়ে, কিছুক্ষণ হাত দিয়ে জল কেটে কেটে, শেষ পর্যন্ত উঠে বসেছে ছইয়ের ওপর। ওই অল্প একটু ওপর থেকে চারদিকটাকে একসঙ্গে বেশ ভালো করে দেখা যায়। 'ওখানে সর্দারি করার কী দরকার, নেমে আর নিচে' বলে বারে বারে ডাকতে থাকে মা আর বড়োমামি, আর সেইজন্যেই আরো বেশি বসে থাকতে ইচ্ছে করে ওখানে, যেন মস্ত একটা বড়োদের মতো কাজ।

আসলে, দাদা যেবার সঙ্গে ছিল, পুরোটা পথ সেবার ওইরকম ছইয়ের ওপর বসে ছিল দাদা, আর গান গাইছিল গলা খুলে : 'খর বায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে।' কেউ কেউ বলেছিল তখন : 'ও আবার কী দাদা, এটা কী গাইছ, মেঘ দেখলে কোথায়?' গান শেষ হবার পর (কিছুক্ষণের মধ্যে অন্যেরাও মিলিয়েছিল গলা) রাগ করে বলেছিল দাদা : 'চারপাশটাকে মিলিয়ে নিয়ে তবে গাইতে হবে না কি? ওর মধ্যে আমি নেই।' নীলুর অবশ্য মনে হয়েছিল, কেন, মিলছেও তো। নৌকোতে তো বলাই যায় 'ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো।' আর তাছাড়া, ওই যখন সবাই 'হাঁই মারো, মারো টান, হাঁইয়ো হাঁইয়ো হাঁইয়ো' গেয়ে উঠছিল, তখন কেমন তালে তালে বৈঠা পড়ছিল না মাঝিদের?

যাহোক, সেই থেকে নীলুর অভ্যাস হয়েছে ছইয়ের ওপর বসে থাকা। 'পড়ে যাবি যখন, বুঝবি মজা' নিচের থেকে তর্জন শোনা যায় আবার। কিন্তু ওকথা শুনে আর ভয় পায় না নীলু। এখন কি আর জলকে কিছু পরোয়া করে সে? এখন তো সে সাঁতারই জানে। ডুবতে ডুবতে একবার বেঁচে গিয়েছিল বলে জেদ করে শিখে নিয়েছিল সাঁতার, হারুনের কাছে। সেই থেকে আর ভয় নেই তার।

উঃ, সেই ডুবে যাওয়ার কাণ্ডটা। ভাবলে তার গায়ে কাঁটা দেয়! কী হতে পারত সেদিন!

পুজোর কটা দিন শেষ হয়ে গেছে তখন। সবাই মিলে খেলা হচ্ছিল একদিন দুপুরবেলায়, মেজদি সোনাদি রঞ্জুদা সঞ্জু ঝুম্পু আলো সবাই ছিল সেদিন, সঙ্গে ছিল বেনেবাড়ির খোকন আর নীলুর বন্ধু হারুন। পুজোর এই একমাসের জন্য নিজের সব বন্ধুকে ছেড়ে থাকবে বলে কষ্ট হয় যখন, নীলু তখন সান্ত্বনা পায় এই হারুনের কথা ভেবে। দাদুর খুব আদরের আবদুল ঘরামি, হারুন তার ছেলে। নীলুর চেয়ে বয়েসে একটু বড়ো। বাড়ির সব কাজেই ডাক পড়ে আবদুলের, তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে হারুন। এমনি করে দেখতে দেখতে নীলুর সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে গিয়েছিল তার, তাদের সব ভাইবোনেরই সঙ্গে। পুজোর সময়টা এলেই, অন্য সব ভালো কথার মতো নীলুর মনে হতে থাকে হারুনেরও কথা। সেজোমামাকে দেখতে পাবে, ফুলমামিকে, হারুনকে—পুজোয় বাড়িতে আসবার এ যেন এক বাড়তি আনন্দ তার।

সেই হারুনও ছিল সেদিনকার খেলায়। খেলা হচ্ছিল মণ্ডপের বারান্দায় বসে। বিসর্জন হয়ে যাবার পর ফাঁকা কাঠামোটা পড়ে আছে, তারই কাছাকাছি কাদার তাল নিয়ে নানারকমের খেলনা বানাচ্ছিল তারা, হাঁড়িকুড়ি হাতাখুন্তি। ঘরকন্নার খেলা হচ্ছিল সবাই মিলে।

হতে হতে প্রায় সন্ধ্যে গড়িয়ে আসে। ঘরে ফিরবার জন্য রাগ করে

তাড়া দিতে আসে মেজোমামি। হাতে পায়ে সবার কাদা দেখে বকতে থাকে গলা খুলে। হঠাৎ যেন থমকে যায় হারুনকে দেখে। একটু থেমে গিয়ে, তারপর বলে: 'এ কী, তুই? তুইও এর মধ্যে? একেবারে মণ্ডপের ওপর? ছী-ছি-ছি! জাতধম্মো আর রইল না কিছু। নাম্, নাম্ শিগগির। নেমে আয় বলছি।'

ভয়ে ভয়ে নেমে আসে হারুন। মেজোমামি প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে দালানে। নেমে আসে নীলুরাও। একটু পরে মা এসে দাঁড়ায়। সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে: 'যা সবাই। পুকুরে হাত-পা ধুয়ে আয় ভালো করে, দেরি করিস না বেশি।'

হারুনেরও দিকে তাকায় মা একবার, কিছু না বলে ফিরে যায় আবার।

খেলার সব ফুর্তিটা হঠাৎ যেন মাটি হয়ে গেল। সন্ধ্যে হয়েছে বলে এত রাগারাগি? না কি কাদা নিয়ে খেলেছি বলে? না কি হারুন-খোকনের মতো বাইরের ছেলেরা সঙ্গে ছিল বলে? কিন্তু খোকনকে তো বলল না কিছু? কেবল হারুনকেই কেন নেমে আসতে বলল মেজোমামি?

পুকুরের দিকে চলেছে ওরা সবাই। শুধু খোকন ফিরে গেছে, আর হারুন ওদের সঙ্গ নেয়নি এবার। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে দূর থেকে। নীলু জিজ্ঞেস করে সোনাদিকে: 'হারুনকে ও-রকম বকল কেন রে মেজোমামি?'

'ও তো বাঙালি না, ও মুসলমান তো, সেইজন্য।'

শুনে খুব মনখারাপ হয়ে গেল নীলুর। 'বা রে, তাতে কী হয়েছে' মনে মনে তর্ক করতে লাগল সে। সবসময়েই তো একসঙ্গে দৌড়ে খেলে বেড়িয়েছে তারা, মণ্ডপের বারান্দায় বসলেই দোষ? মণ্ডপের চালাটা যেবার ভেঙে গিয়েছিল, আবদুলই না নিজের হাতে সারিয়ে দিয়েছিল

সেটা ? আর নীলু ? নীলু তো ওদের ঘরের একেবারে ভিতরে গিয়ে বসে ওদের বিছানার ওপর। মনে নেই সেবার সেই ইদের দাওয়াত ? পুজো আর ইদ সেবার ছিল কাছাকাছি সময়ে। উঠোনে বসে লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খেতে খেতে হারুন বলেছিল : 'কয়দিন পরেই ইদ, আমাগো ঘরে যাবি তো হেইদিন ? দাওয়াত দিলাম কিন্তু।' গিয়েছিল তো নীলু। কত আদর করে সেমুই খাইয়েছিল হারুনের আম্মাজান। দেবার আগে বলেছিল অবশ্য : 'খাবা তো মনু ? বকপে না তো কেউ তোমারে ?' কই তার জন্য তো আবদুল কখনো বকেনি তাকে! নেমে বসতে বলেনি তো বিছানা থেকে। তাহলে ?

আর, সোনাদি কেন বলল ওরা বাঙালি না ? বাঃ, বাঙালি না তো বাংলায় কথা বলে কেমন করে ? কী যে বলে! মনে পড়ে তার মাস্টার-মশাই নির্মলবাবুর কথাগুলি। ইস্কুলের বাংলা বইয়ে একটা গল্প ছিল 'শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ'। গল্পের সেই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্পের শ্রীকান্তের প্রথম দেখা হয়েছিল না কি এক খেলার মাঠে। 'ইস্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ'-এর একটা বর্ণনা শুনিয়ে নির্মলবাবু বলেছিলেন : 'দেখেছ তো, বড়ো লেখকেরাও কেমন ভুল করে বসেন ? এ-ভুল যেন তোমরা কখনো কোরো না। বাঙালি ছাত্র আর মুসলমান ছাত্র, এ-রকম কোনো ভাগ হয় না কি ? বলতে পারো বাঙালি আর বিহারি, নয়তো বলতে পারো মুসলমান আর হিন্দু। দুটোয় গুলিয়ে ফেললেই মুশকিল। একটায় জাতের কথা, একটায় ধর্মের কথা।' বলেননি নির্মলবাবু ? সোনাদিরা কেন বুঝতে পারে না সেটা ?

সবাই হাত-পা ধুয়ে উঠে যাচ্ছিল একে একে, চুপচাপ। আর পিছল ঘাটের এক কোনায় দাঁড়িয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে আনমনে পা ঘষছিল নীলু, আর হঠাৎ, কেমন করে কী হলো, ঝুপুস করে একেবারে জলের মধ্যে পড়ে গেল সে।

সমস্ত গায়ে জলের ছোঁয়া, চোখের সামনে জল, মাথার ওপর জল, এলোমেলো হাত-পা ছুঁড়ছে নীলু। যতই ভাবছে ওপরে উঠবে ততই যেন নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। ভীমের মতো পাতালপুরীতে নেমে যাচ্ছে না কি? মরে যাচ্ছে সে? ভয়ে চোখ বুজে গেল তার, আর সেই মুহূর্তে মনে হলো কে যেন তার চুলের মুঠো ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে কোথাও।

একটু পরে চোখ মেলে দেখে, ঘাটের ওপরেই শুয়ে আছে সে। পাশেই হারুন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তারও সমস্ত গা ভেজা। ভাই-বোনদের চেঁচামেচিতে দালান থেকে ছুটে এসেছে সবাই। 'ওই ছেলেটা না থাকলে কী কাণ্ডই হতো আজ—' বলছে সবাই। পুকুরের কোণঘেঁষা একটা কামরাঙা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেজোমামি।

মা ডেকে বলেছিল: 'যাবার সময়ে একটু মিষ্টিমুখ করে যাস হারুন—'

আর সেইটে শুনেই লম্বা একটা দৌড় দিয়েছিল জলেভেজা হারুন, একেবারে তার নিজের ঘরের দিকে।

ওরই কদিন পরে, ওই পুকুরেই, হারুন তাকে শিখিয়েছিল সাঁতার। খুবই সহজ, মনে হয়েছিল নীলুর। আর, একবার তা শিখে নেবার পর জলকে কি আর ভয় করে কেউ?

কাউখালি চলে গেছে, জলাবাড়িও পেরিয়ে যায়। বৈঠা রেখে ইয়াকুব আর ইয়াসিন এবার নেমে পড়েছে ডাঙায়। নৌকোর খুঁটির সঙ্গে শক্তপোক্ত একটা কাছি বেঁধে নিয়ে, সেইটে ধরে টানতে টানতে চলেছে দুজন, রহমৎ ধরে আছে হাল। অনেকক্ষণ নৌকোয় থাকতে থাকতে মাথার মধ্যে ঘোর লাগে একটা, সেটা কাটাবার জন্য নীলুও ওদের সঙ্গে নেমে যায় ডাঙায়। নৌকোয় গুণটানার এই সময়টা

বেশ ভালো লাগে তার। ইয়াকুবদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সেও ধরে কাছি, আর জোলো ঘাসজমিতে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বুক ভরে টেনে নেয় তাজা বাতাস, আরাম হয় বেশ। মনে হয় যেন, আ, কতদিন পরে যেন পা ফেললাম মাটিতে!

চলতে চলতে নীলুর মনে হয় গাছগুলি কত ঘন আর কেমন তাজা সবুজ হয়ে আছে এখানে। প্রায় যেন চেনা চেনা লাগে এবার। ছিপ্-ছিপে ওই সুপুরি গাছ আর স্বাস্থ্য-ভালো নারকেল গাছগুলির ভিড় শুরু হলেই নীলু বুঝতে পারে তারা পৌঁছে গেছে প্রায়। যেন, তাদের খালের ভিতরে ঢুকে যাবার আগে নদীটার দুপাশে যেমন চেহারা, সেইটেই এখন দেখতে পাচ্ছে। আর, ওই তো, কাছেই স্বরূপকাঠির একেবারে কোন্ ভিতর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ! বোধনের ঢাক। আজ তো ষষ্ঠী।

ফিরে আসে নীলু নৌকোয়। গলুইয়ের ওপর মাটির হাঁড়িতে ভাত ফোটানোর ভারি একটা ফুরফুরে গন্ধ নাকে এসে লাগে। স্টিমারের আর নৌকোর এই দু-রকমের গন্ধ, একেবারে আলাদা। স্টিমারের যারা খালাসি, তাদের কাছাকাছি গেলেই পেঁয়াজেরসুনে-মাখা একরকম মুরগির মাংসের গোপন গন্ধ পাক খেতে থাকে চারদিকটায়। আর নৌকোর মাঝিদের আছে এই হাঁড়ির-মুখে মাটির-সরা-উথলে-দেওয়া টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ ভাতফোটার আরাম-দেওয়া গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে বেশ খিদে পেয়ে যায় নীলুর।

কিন্তু ওটা তো ইয়াসিনদের ভাত। তারা কী খাবে?

ঢুকে যায় সে ছইয়ের ভিতরে, মায়েদের কাছে।

৩

ওই তো, ওই দেখা যায় স্টিমারঘাটা!

আগে হুলার হাট থেকে আরেকটা স্টিমারে উঠে সরাসরি গ্রামে এসে নামতে পারত নীলুরা। ওই সেই ঘাট। কিন্তু যুদ্ধের জন্য স্টিমারটা বন্ধ ছিল কবছর, যুদ্ধ শেষ হবার পরেও এখনো আর চালু হয়নি সেটা। নীলুদের তাই এ-পথটা এখন আসতে হয় নৌকোয়। একটু দেরি হয়ে যায় তাতে, কিন্তু ভালোই তো সেটা। এ আরেক রকমের যাওয়া তো!

ওই স্টিমারঘাটাকে পিছনে ফেলে অল্প একটু এগোলেই হাটখোলা, তারপরেই এবার ডাইনে একটা বাঁক নেবে নৌকো, ঢুকে যাবে সরু একটা খালের মধ্যে। এ-খাল যেন একেবারে তাদেরই খাল, এক্কেবারে তাদের নিজেদের। খালটুকু দিয়ে যেতে যেতে, মাটিতে পা দেবার আগেই, গোটা গ্রামের ঘর-গেরস্তালিকে যেন ছুঁতে পায় ওরা, শাপলা-শালুক জলকাদা আর বুনো আগাছার গন্ধে। ওই তো আসে সবুত্তরের বাড়ি। সবুত্তর যে আসলে সবচেয়ে উত্তর, সেটা অবশ্য জানে এখন নীলু। সেটা পেরিয়ে গেলে পাবে বড়োবাড়ির ঘাট, ঘোষের বাড়ির ঘাট, তারপর সেই ভূত-ছমছম ছ-আনি বাড়ির ভাঙা দালানটা, জংলা জমি, আর তার ঠিক পরেই তাদের মামাবাড়ি, যাকে এখন 'বাড়ি' বলেই জানে তারা। বাড়ি, বাড়ি, বাড়ি!

সবাই মিলে আসত যখন, খালের মধ্যে ঢুকেই তাদের শুরু হয়ে

যেত তর্ক। সে-তর্কে কোনো ঝাঁজ থাকত না অবশ্য। মেজদি বলত: 'বল্ দেখি এবার কেমন কার্তিক?' কেউ বলত বাবু-কার্তিক, কারো-বা মত সেনাপতি-কার্তিক। বাবু। না, সেনাপতি। বাবু। না, সেনাপতি। আচ্ছা, চলো তো আগে, দেখা যাবে কে জেতে।

এটা নীলু লক্ষ করেছে যে বোনেরা প্রায়ই থাকত টেরিবাগানো কোঁচাধরা খালিগায়ের বাবু-কার্তিকের পক্ষে, আর ভাইদের ঝোঁক ছিল ঝল্‌মলে পোশাকপরা তীরধনুক-ধরা যুদ্ধসাজের সেনাপতির দিকে। তর্কে জিতবার জন্য কোনো-কোনোবার অবশ্য নীলু আগেই গোপনে লিখে দিত দাদুকে: কুমোরকে কিন্তু বলে দেবে দাদু, এবার আমাদের সেনাপতি-কার্তিক চাই-ই চাই।

এবার অবশ্য সে-তর্ক নেই কোথাও। একে তো সঙ্গেই নেই কেউ, তার ওপর মা বারেবারেই বলে দিয়েছে: 'এবার যেন কোনো উটকো বায়না করবি না, এবার কোনোরকমে দায়সারা পুজো, নমো নমো করে।'

সন্ধ্যের মুখে নৌকো এসে লাগে তাদের ঘাটে। বৈঠা ছেড়ে লগি বার করে ইয়াসিন। অল্প জলের কাদার মধ্যে লগি ঠেলতে ঠেলতে নৌকোটাকে ঘাটের দিকে আনতে থাকে ওরা, আর পুরোপুরি আনবার আগেই ছই থেকে মস্ত এক লাফে পাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নীলু। রহমত বলে: 'আরে অত তড়বড় কইরেন না খোকাবাবু, খাড়ায়েন খাড়ায়েন।' সামনের লম্বা পথটা ধরে খোকাবাবু ততক্ষণে সোজাসুজি দৌড়োতে থাকে দালানের দিকে। বাঁয়ে পুকুরধার আর মণ্ডপটাকে রেখে ডাইনে সারি সারি সুপুরিগাছ আর কাছারি ঘরকে ফেলে, কয়েকটা লাফে সে টপ্‌কে যায় সামনের সিঁড়িগুলি, আর হাঁক দিয়ে বলে: 'এসে গেছি আমরা, দিদিমা।' মাঝখানে চকিতে একবার দেখে নেয় অবশ্য, আবছা আলোয় মণ্ডপের মধ্যে ওই—হ্যাঁ, এবার তাহলে সেনাপতি-কার্তিক।

উলটো দিকের সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘর থেকে দালানে উঠে আসছিল দিদিমা, হাতে একটা কুপি জ্বালিয়ে। দেখা হয়ে যায় তাদের, আর তাড়াতাড়ি জানলার কিনারায় কুপিটা রেখে দিদিমা বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে : 'এসে গেছ, এসে গেছ মন্টু ? অ কুঞ্জ, কুঞ্জ রে, একটা লণ্ঠন নিয়ে খালের পাড়ে যা শিগগির। আর কে এল ? কে কে ?'

আধা-অন্ধকারে দাপিয়ে বেড়ায় নীলু, এ-ঘরে ওই-ঘরে। খাটের ওপর, চেয়ার টেবিল আলনা সিন্দুক সবকিছুর ওপর একবার করে হাত বুলিয়ে আসে। দাদুর ঘরে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই দাদু শুধু বলে : 'এসে গেছিস ?' বলে বসেই থাকে অবশ্য, চুপ করে। হাতে একটা গড়গড়ার নল ধরে টানতে থাকে ভুড়ুক ভুড়ুক। জল-টল্‌টল্‌ শব্দটা শুনতে শুনতে নীলু আবার বেরিয়ে যায় বাইরে। শিউলিগাছের গন্ধভরা উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে ভাবে, কী আশ্চর্য, এবার কত চুপচাপ লাগছে গোটা বাড়িটা।

রাত যখন আটটা, তখনো সেজোমামা এল না। ফুলমামিই বা কোথায় ? দিদিমার কাছে জানতে চেয়ে ঠিক মতো জবাব মেলে না। বলে : 'দেখো গিয়ে পড়ে আছে কোথায় !'

'কে ? ফুলমামি ?

'না, তোর সেজোমামার কথা বলি। ফুলমামি তো ঘুমোয়, সন্ধ্যে থেকেই ঘুমোয় পড়ে-পড়ে। এই এক জ্বালা হয়েছে আমার।'

'কোথায় পড়ে আছে, সেজোমামা ?'

'কে জানে কোন্ চুলোয়, কোন্ দেশোদ্ধারের কাজে !'

সত্যি যদি দেশোদ্ধার হয়, সে তো ভালোই কাজ। দিদিমা এত রাগ করে কেন তবে ? কিন্তু কথা হচ্ছে, এবার কোন্ দেশোদ্ধার। এক-একবার সেজোমামাকে এক-একরকম নেশায় দেখে নীলু। একবার তাকে

বোঝায় সেজোমামা : 'শোন্, আমাদের গ্রামে ভালো একটা হাসপাতাল করতে হবে, বুঝলি। ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। চৌকি আর কম্বলও জোগাড় করা যাবে। এখন দরকার হলো ওষুধ। আর দরকার ডাক্তার। দাঁড়া, এবার খুঁজতে হবে সেটা।' একটু ভেবে নিয়ে আবার বলে : 'বড়ো হয়ে তুই কী হবি বল্ তো? ডাক্তার হবি। বুঝলি, ডাক্তার হবি আর এইখানে এসে থাকবি। কী? হবি তো?'

সঙ্গে সঙ্গে নীলুর ভাবতে ভালোই লাগে যে সে মস্ত একটা ডাক্তার হয়েছে, যে-কোনোরকম অসুখ সারিয়ে দিয়ে মুখে হাসি ফোটাচ্ছে সবার। কিন্তু পরের বারেই সেজোমামা তাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে বলে, কেননা তাদের খালের ওপর অনেক ব্রিজ না বানালে এ-গ্রামে ও-গ্রামে যাওয়া-আসা সহজ হচ্ছে না মোটে। কোনোবার নীলুকে শপথ নিতে হয় ভালো মাস্টার হবার, তাদের গ্রামে একেবারে অশ্বিনী দত্তের ব্রজমোহন স্কুলের মতো একটা নামকরা ইস্কুল চাই-ই চাই।

এসব নেশা পালটে যায় বছরের পর বছর। কিন্তু সেজোমামার অন্য একটা নেশা আছে, যা পালটায় না কখনো। সেটা হলো থিয়েটারের নেশা। ডাক্তারই হোক আর মাস্টারই হোক আর বেকারই হোক, বড়ো হয়ে নীলুকে অ্যাক্টর যে হতেই হবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেজোমামা কেবলই বলে : 'আরে দূর দূর, কলকাতার স্টেজে থিয়েটার আবার থিয়েটার না কি! কোথায় লাগে আমাদের গ্রামের থিয়েটারের কাছে! "কর্ণার্জুন"-এ তোর মণ্টু কাকার অর্জুন আর রুনু-মামার কর্ণ—এর কাছে কোথায় লাগে কলকাতার অ্যাক্টর! দূর দূর!' সঙ্গে টিপ্পনী জুড়ে নীলু বলে : 'আর তোমার ঘটোৎকচ? সেটাও বলো।' একটু লাজুক হেসে সেজোমামা বলে : 'হ্যাঁ, বলতে পারিস সেটাও।'

হঠাৎ কোনো ঘরে ঢুকে পড়লে এমন অনেক সময়ে দেখা যায় যে একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে মুখ-চোখ বাঁকিয়ে সেজো-

মামা হয়তো বলে যাচ্ছে রঘুপতির কথা 'দেবতা না যদি থাকে ব্রাহ্মণ রয়েছে' কিংবা 'তুমি শুনিয়াছ দেবীর আদেশ? আমি শুনি নাই?' রবীন্দ্রনাথের এই 'বিসর্জন' নাটকটা এতই পছন্দ সেজোমামার যে নীলুদের সব ভাইবোনকেই কখনো-না-কখনো করতে হয়েছে এর অভিনয়। তাদের পরিবার জুড়ে কত-যে জয়সিংহ আর কত রঘুপতি আছে, তার হিসেব করাই মুশকিল।

বাবু-কার্তিক না সেনাপতি-কার্তিক, সংশয়ের এই উত্তেজনার মতোই প্রতি বছর দেশে আসবার সময়ে আরো একটা উৎকণ্ঠা কাঁপতে থাকে নীলুদের মনে; থিয়েটার তো আছেই, কিন্তু এবার আরো কোন্ নতুন নেশা দেখব সেজোমামার?

৪

সপ্তমীর সকালে, পুজো শুরু হবার আগে, বড়ো-একটা জমায়েত হবার কথা দাদুর ঘরে। এক বাণ্ডিল নতুন ধুতি শাড়ি পাশে নিয়ে খাটের ওপর বসে থাকে দাদু, আর নাম ধরে ডাকতে থাকে একে-একে বড়ো থেকে ছোটো : গোঁসাই—, নন্তু—, ভানু—, কানু—, মনু—। ডাক পেয়ে মামারা একজন একজন করে এগিয়ে যায় দাদুর দিকে আর দাদু একখানা করে ধুতি তুলে দেয় তাদের হাতে। তারপর আসে মায়েদের ডাক : বড়োবৌ—, খুকি—, মেজোবৌ—, ফুলবৌ—

মায়েরা যখন একখানা করে কোরা শাড়ি নিয়ে আসে দাদুর হাত থেকে, সেই সময়টা নীলুদের একটু বেশি ভালো লাগে। শাড়ির সবুজ নীল লাল নানারকমের পাড়, বেশ-একটা রঙের ঝকমকি তৈরি হয় চোখের সামনে। কে পাচ্ছে কোন্ রং? এই আরেক ছটফটানি। তার সঙ্গে আছে গন্ধের বাহার। আনকোরা নতুন কাপড়ের ভারি একটা মজার গন্ধ আছে না? সেই গন্ধটা বুকের ভিতর পর্যন্ত নিতে নিতে ছুটে যায় ওরা মায়েদের কাছে, আরো একটা লোভে। শাড়ির ওপর ঢাকেশ্বরী কটন মিলের সোনালি-রুপোলি লেবেল লাগানো, অনেক ডিজাইনের. সেগুলো তাদের চাই। অনেকদিন খেলা যাবে না তা দিয়ে?

এবার অবশ্য লোক কম, তাই দাদুর ডাকও কম। সেই ডাকের অপেক্ষায় মা সেজোমামা বড়োমামা বড়োমামি জড়ো হয়েছে ঘরে, কিন্তু

ফুলমামি নেই সেখানে।

ফুলমামি তবে কোথায় গেল? কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে এখন পর্যন্ত তাকে দেখাই গেল না মোটে! এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল নীলু, যদিও সে বোঝে যে এভাবে নিশ্চয় পাওয়া যাবে না। হয়তো-বা খালের ধারে বা পুকুরপাড়ে বসে আছে কোনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে। নীলু এটা বুঝতে পারে যে ফুলমামিকে এ-বাড়িতে পছন্দ করে না কেউ। না-করবার কারণ যে নেই, তা নয়। কারো সঙ্গে কথা বলবে না, কাজ করবে না কিছু। শুধু এই কোণে ওই কোণে চুপ করে বসে থাকবে। হঠাৎ কখনো কেঁদে উঠবে ডাক ছেড়ে, আর কখনো-বা নিজের সঙ্গে নিজেই বলবে কথা। তাহলে কি ভালো বলে কেউ? একলা একলা কথা বলাটা শুনতে পেয়েছে নাকি অন্যেরা। হঠাৎ কেউ থমকে দাঁড়িয়ে যদি জিজ্ঞেস করে 'কী বলছ গো', তাহলে বড়ো বড়ো চোখ মেলে ঠোঁট বাঁকিয়ে আবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবে মুখ। তাকেই কি পাগল বলে?

পুকুরের দিকে যাবার আগে চিলেকোঠাটা দেখলে হতো না একবার? এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাতের দিকে উঠে যায় নীলু. ডান দিকে বাঁক নিয়ে দেখে--না, টানটান করে একটা পাটি পাতা আছে বটে, কিন্তু নেই কেউ চিলেকোঠায়। নামতে থাকে নীলু। নামবার পথে সিঁড়ির কোনায় অন্ধকার খুপরি থেকে খস্‌খসে একটা আওয়াজ শুনে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে সে।

সিঁড়ির তলার খুপরিটাকে এখানে বলে আন্ধাইরা কোঠা। নীলুর বেশ মজা লাগে ওই শব্দটার জন্য। ওই ঘরের—যদি ঘর বলা যায় ওকে—জানলাটা যদি বন্ধ থাকে তো একেবারে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার—দিদিমারা বলে আন্ধার। আর তাই, ঘরেরও নাম আন্ধাইরা ঘর, আন্ধাইরা কোঠা। লুকিয়ে লুকিয়ে আচার চুরি করে খাবার এত ভালো

জায়গা আর নেই!

হ্যাঁ, ঠিক! যা ভেবেছিল, তা-ই। ওই আঁধার ঘরের আধখানা জানলা খোলা রেখে তার পাশে ছোট্ট একটা টুল পেতে বসে আছে তাদের ফুলমামি। উড়ু উড়ু চুলগুলি খোলা, মুখের দুধার দিয়ে উথলে উঠছে ঢেউ, লাল পাড়ের শাড়ির আঁচলটা একটুখানি তুলে দেওয়া মাথায়, জ্বলজ্বলে একটা সিঁদুরের টিপ, আর কোলে ছোট্ট একটা ঝুড়ির মধ্যে হরেকরকম জিনিসের সঙ্গে মস্ত একটা ডলপুতুল।

নীলুকে দেখে ফুলমামি অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল, বলল না কিছু। কী, চিনতে পারছ না নাকি? নীলুর মনে মনে একটা ধারণা ছিল যে ফুলমামি তাকে পছন্দই করে, আর এখন নাকি চিনতেই পারছে না তাকে? বেশ, আমিও তবে কথা বলব না—ভাবল নীলু। আমি যে এত কষ্ট করে খুঁজতে খুঁজতে এলাম, সেটা বুঝি কিছু না? আর, অতক্ষণ তাকিয়েই বা আছ কেন তুমি, কথা যদি না-ই বলবে?

হঠাৎ ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল ফুলমামির! কাঁদবে না কি? না, আস্তে করে জিজ্ঞেস করল শুধু: 'কখন এলি? কবে?'

'বাঃ, আমরা তো এসে গেছি সেই কাল সন্ধ্যেবেলা। তখন থেকেই তো তোমার দেখা নেই কোথাও। সবারই সঙ্গে দেখা হলো, তোমার সঙ্গে না। কোথায় লুকিয়ে রইলে সব সময়ে? তুমি কি এ-বাড়ির কেউ না?'

আবার একটু চুপ করে রইল ফুলমামি। তারপর বলল: 'না, আমি এ-বাড়ির কেউ না।' তারপর আবার: 'আমি কোনোবাড়ির কেউ না।'

এই শেষ কথাটা বেশ শক্ত করে বলল ফুলমামি, শক্ত স্বরে। নীলুর কেমন ভয় হলো। আঁধার ঘরের আধখানা জানলা দিয়ে অল্প একটু আলো এসে ফুলমামির আধখানা মুখের ওপর পড়েছে, বাকিটা আছে

ছায়ায়। মনে হয় দুটো চোখের একটা যত ঝক্‌ঝক্‌ করছে, অন্যটা যেন তত নয়। একটু ভয়ে ভয়ে নীলু বলল: 'এইখানে বসে আছো কেন তুমি, একা? ওপরে চলো-না, চিলেকোঠায়?'

'চিলেকোঠায়?' কী যেন একটু ভাবল ফুলমামি, তারপর কোলের বেতের ঝুড়িটা বুকের ওপর চেপে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হঠাৎ, বলল: 'চল্‌, চল্‌ তবে যাই চিলেকোঠায়। তুই যাবি তো, সঙ্গে?'

নীলুর হাতটা বেশ আঁটো মুঠোয় ধরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় টানতে টানতে তাকে তুলতে লাগল ফুলমামি: 'পুজো দেখার শখ হয়েছে খুব, না? খুব শখ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল নীলু: 'না।'

'না? তবে এলি কেন?'

'বাঃ, আসব না? এলাম বাড়ি দেখতে। এলাম তোমাকে দেখতে। এলাম –'

'আচ্ছা আচ্ছা, আর এলামের ফিরিস্তি দিতে হবে না। বোস্‌ এখানে। একেবারে চুপ করে থাকবি। কথা বলবি না মোটে। বুঝেছিস? কথা বললেই তোরা খুব বাজে কথা বলিস।'

চুপ করে বসল নীলু পাটির ওপর। পাশেই বড়ো জানলার লম্বা লম্বা শিক। তার মন খারাপ হয়ে গেছে ততক্ষণে। কথাই যদি না বলবে, তাহলে এল কেন এখানে? ফুলমামির সঙ্গে একবছরের জমিয়ে রাখা অনেক কথা বলবে বলেই তো খুঁজছিল তাকে! এখান থেকে জানলার বাইরে তাকালে খিড়কিপুকুরটা দেখা যায়, মায়েদের স্নান করবার জন্য বেড়া-দেওয়া পুকুর। তার ডান পাশ দিয়ে কাছারি ঘরের পিছন দিকের সারি সারি সুপুরিবাগান। একবার সেদিকে তাকিয়ে, একবার ফুলমামির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল নীলু, লোকে যে কখন কী ভাবে তা কেউ বলতে পারে না। না? এই একটু আগেই

ফুলমামিকে দেখার জন্য কত ব্যস্ত হয়েছিল সে, আর এখন, তার হাতটা মামির মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরা না থাকলে হয়তো এক্ষুনি দিত নিচের দিকে দৌড়।

কিন্তু না, ওই তো যেন মুখের আদলটা একটু একটু পালটে যাচ্ছে কেমন। একটু আগে চামড়াটা যেন শক্ত আর টান-টান লাগছিল, লাগছিল রাগের মতো, আর এই যে এখন কেমন নরম হয়ে আসছে মুখ।

'কী ভাবছিস রে?'

'কিছু না তো।'

'কিছু-না আবার কী! কিছু তো নিশ্চয় ভাবছিস।' একটু থেমে, আবার বলে, যেন নীলুকে নয়, যেন আপন মনে: 'না ভেবে কি উপায় আছে? কিছু তো ভাবতেই হবে। না সোনামণি?'

এই শেষ প্রশ্নটা অবশ্য নীলুকে নয়। ঝুড়ি থেকে পুতুলটা তুলে নিয়ে তার চোখে চোখ রেখে ফুলমামি বলে: 'না? না সোনামণি?'

কথাটাকে কোনোরকমে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য ঝুড়ির দু-একটা খাতা দেখিয়ে নীলু জিজ্ঞেস করে: 'এখানে লিখেছ আরো কিছু? এই খাতায়? লিখেছ অনেক কবিতা?'

'লিখেছি'—চোখদুটোতে এবার যেন খুশির ঝলক লাগে একটা: 'পড়বি? পড়্ না। লিখেই যাই লিখেই যাই শুধু। পড়ে না তো কেউ কখনো।'

'লেখো কেন তবে?'

'ইচ্ছে হয় লিখি। আমার খুশি, লিখি। তোর তাতে কী?'

'না, আমার কিছু না। তুমি বললে, তাই বললাম।'

একটা খাতা হাতে তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ পাতা ওলটাতে লাগল ফুলমামি, খুব আস্তে কিছু বলতেও লাগল হয়তো-বা, ঠিকমতো শুনতে পেল না নীলু। একটু পরে, একটা পাতা খুলে দিয়ে খাতাটা বাড়িয়ে

দিল নীলুর দিকে : 'নে, পড়্।'

ঝুঁকে পড়ে নীলু দেখতে লাগল, লাইনটানা খাতার পাতায় গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে ঘনকালো কালি দিয়ে লেখা :

ভালো লাগে না মন।
সকাল থেকে বুকের ভিতর
কেন যে করে এমন।

কেবলই করে ভয়
এত যে লোক এত যে জন
আমার কি কেউ নয়।

দুবার পড়ে নিয়ে মুখ তুলে তাকাল নীলু। বলল : 'তারপর?'

'কী তারপর?'

'আর নেই? এইখানেই শেষ হয়ে গেল?'

'হলো না শেষ? না হলো তো না-ই হলো। আমি কী করব? আমার তো আর কিছু বলার নেই। আমার ওইখানেই শেষ হয়ে গেল।'

'এটা তাহলে কবিতা হবে?'

'না-ই হলো। তাতে আমার কী? কবিতা লিখতে বয়ে গেছে আমার! আমার যা কথা, আমার তা কথা। ব্যস্।'

বাচ্চা মেয়ের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলমামি জানলার দিকে চোখ মেলে দিল আবার। বুঝতে পারল না নীলু, রাগ করেছে কি না। তবে এটা ঠিক যে, এতটুকু কবিতা সে পড়েনি বড়ো-একটা। আর এইরকম কবিতা। ইস্কুলের বইয়ে, ইস্কুলের বাইরে 'শিশুসাথী' আর 'মৌচাক'-এর পাতায় যেসব কবিতা সে পড়েছে এতদিন, সে অনেক অন্যরকম। তার সঙ্গে এর তো কোনো মিলই নেই মোটে। কিন্তু তাই বলে তার কি খারাপ লাগছে কিছু? তা নয় ঠিক। বরং বেশ ভালোই তো লাগছে।

কবিতা হয়েছে কি না তা নীলু বলতে পারবে না, সেটা তাদের মাস্টার-মশাই নির্মলবাবু বলতে পারবেন। কিন্তু তার মনে হলো, ওই-যে আঁধার ঘরের একলা কোণে চুপ করে বসে ছিল ফুলমামি, সেই চুপ থাকা কথা-গুলি যেন তার জানা হয়ে গেল ওইখানে, ওই শব্দগুলির ছোঁয়ায়।

পাতা উলটে আরেকটা লেখায় চোখ বোলাল সে। লেখা আছে ওই একইরকম কালিতে :

ভুতুড়ে বাড়ি ভুতুড়ে বাড়ি
পুরোনো ভাঙা ইটের সারি
বুনো আগাছা, লতা!
যখন ঘুরি একলা ছাতে
আমার কাছে সন্ধ্যারাতে
কী তারা বলে কথা?

এই লেখাটা পড়বার পর আপনা থেকেই নীলুর চোখ চলে যায় জানলার বাইরে, খিড়কিপুকুর পেরিয়েও অনেকটা দূরে, যেখানে একটা ভাঙা বাড়ির স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে অনেক অনেকদিন ধরে, দিনের বেলাতেও যার কাছে দাঁড়ালে গা ছম্‌ছম্‌ করে। সেইদিকে তাকিয়ে ফুলমামির মুখের দিকে ফেরে নীলু, বলে : 'এ নিশ্চয় ওই বাড়িটার কথা, না?'

ফুলমামি ঠিক জবাব দেয় না তার। আনমনে বলে শুধু : 'নিয়ে যাবি একদিন আমাকে, ওই বাড়িটার ভেতর?'

ভয় করে বলেই নীলুর একটু বীর বীর ভাব হলো মনে। বলল : 'হ্যাঁ, যাব। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব একদিন।'

'না, একদিন নয়, কালকেই। নয়তো পরশু। নয়তো—'

বড়োরা যেমন করে ছোটোদের ভোলায়, সেইরকম গলা করে নীলু বলে : 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব তো বললাম, এখন একটু দাঁড়াও না, একটু পড়ি।'

পাতা উলটে আরো একটা লেখা পড়ল নীলু :

সকালবেলার ওই পাখি যে
উড়তে আমায় ডাকছে নিজে
সেই কথাটা বলব আমি কাকে!
এসব তো কেউ বুঝবে না গো
সবাই আমায় বলবে পাগল
গোপন কথা গোপনে তাই থাকে।

যেন ফুলমামিকে বলার মতো করে নয়, যেন নিজেরই মনে বলবার মতো উচ্চারণ করে নীলু: 'আমাকেও ডেকেছিল একদিন। সেটা ছিল চন্দনা। তোমাকে কে ডেকেছিল? কোন্ পাখিটা?'

কোনো কথা বলে না ফুলমামি, চেয়ে থাকে নীলুর মুখের দিকে। একটু পরে বলে: 'এসব যেন বলিস না কাউকে। বুঝলি তো? বললে কিন্তু সবাই পাগল বলবে তোকে।'

'কী কথা?'

'ওই চন্দনার কথা। পাগল বলবে।'

'পাগল বলবে? বাঃ, কেন?'

'হ্যাঁ বলবে। নিশ্চয়ই বলবে। কেন বলবে না?'

আবার ফুলমামির চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যাচ্ছে আর গলার স্বরটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে ভেবে তাড়াতাড়ি বলে উঠল নীলু: 'বেশ, বলুকগে, কিন্তু এই লেখাটায় একটা গোলমাল হয়েছে।'

'গোলমাল? কী রকম?'

'এই-যে, এই জায়গাটায় মেলাতে পারোনি তুমি। এই-যে "না গো" আর "পাগল"। নাগোর সঙ্গে পাগলের কি মিল হয়?'

একটু থেমে থেকে ফুলমামি বলে: 'হয় না? হয় না হয়তো। কিন্তু মেলাতে গেলে যা লিখতে হবে সেটা তো আমি ভাবিনি। আমি ওই-রকমই ভেবেছিলাম। না মিললে কী আর হবে। কেউ তো আর পড়তে

যাচ্ছে না।'

ফুলমামি হয়তো একটু কষ্ট পেয়েছে ভেবে নীলু বলে ওঠে: 'কিন্তু মজা কী জানো, শুনতে ভালোই লাগছে। কানে শুনবার সময়ে, মিল-যে নেই, তা কিন্তু মনেই হচ্ছে না। অমিলটাও বেশ মিল! না?'

এমন সময়ে সিঁড়িতে কারো একটা পায়ের শব্দ উঠতে লাগল। 'কী এত মিল-অমিলের কথা হচ্ছে শুনি? কিসের মিল?' উঠে এল মা। 'ও প্রমীলা, তুমি এখানে!' নীলুর দিকে তাকিয়ে মা বলে: 'সারা বাড়ি খুঁজে হয়রান। যা শিগগির, নিচে যা। বাজারে যাবি না? সেই তখন থেকে ডাকছে দাদু।'

বলেই নিচে নেমে যাচ্ছিল মা, কিন্তু দু-পা নেমে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে: 'আর তুমিই বা সারাদিন এখানে পড়ে থাকো কেন গো? বচ্ছরকার দিন, সবাই এসেছি আমরা, একটু তো দেখাশোনাও করতে পারো, থাকতেও তো পারো কাছাকাছি। রান্নাঘরে মা কি আর সবদিক সামলাতে পারে একা? মার যে বয়েস হয়েছে দেখতে পাও না? একটু তো যেতেও পারো রান্নাঘরে?'

হাতের পুতুলটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে ঠাণ্ডা গলায় ফুলমামি বলে: 'রান্নাঘর আমার ভালো লাগে না।'

'ব্যস, হয়ে গেল কথা! রান্নাঘর ওনার ভালো লাগে না!'

দুম্‌দাম্‌ করে নিচে নেমে গেল মা।

গলা নামিয়ে নীলু বলল: 'খাতাটা রইল এখানে। বাজার নিয়ে এসে আবার আমি পড়ব কিন্তু। বসে থাকবে তো এখানে? ঠিক তো?'

৫

দাদুর সঙ্গে বাজার করতে যাওয়া একটা মজার ব্যাপার। বোঝাই যায় না যে বাজারটা কি আজকের না কালকের না কি পরশুকার জন্য। অন্য সময়ে কুঞ্জকেই নিয়ে যায় দাদু, কুঞ্জ দাদুর সব সময়ের সঙ্গী, তাকে দিয়ে অন্য কোনোই কাজ হয় না বলে দিদিমা খুব রাগ করে সব সময়ে। দিদিমা কোনো কাজ দিলেই অমনি দাদুর হাঁক শোনা যাবে : 'কুঞ্জ, কুঞ্জ রে!' কিন্তু তারা যখন এসে যায় বাড়িতে, দাদুর বাজারের সঙ্গী তখন নীলু আর রঞ্জুদা। এবার তো আর রঞ্জুদারা নেই কেউ, এবার তাই নীলু একাই চলেছে, দাদুর সঙ্গে।

বাজারের দিকে পথ দিয়ে চলবে দাদু, কিন্তু প্রথমেই হয়তো হাঁটতে শুরু করল একেবারে উলটোদিকে। 'ওদিকে কেন, দাদু?' 'দাঁড়া, আবদুলকে একটা খবর দিয়ে যাই আগে। কাছারিঘরটার একটু মেরামতি লাগবে।' আবদুলকে যদি পাওয়া গেল তো সেইখানেই দাওয়ায় বসে কাটল খানিক সময়। তখন হারুন থাকলে নীলুরও মজা, কিন্তু না থাকলে অধীর হয়ে নীলু হয়তো বলে : 'দাদু, বেলা হয়ে যায়, দিদিমা কিন্তু তাড়াতাড়ি বাজার দিয়ে আসতে বলেছে।' 'থাম্ থাম্, তাড়া কিসের' বলে দাদু হাঁটতে শুরু করে আবার অন্য দিকে।

বাজার করতে গিয়ে গোটা গ্রামটাকেই এভাবে একবার দেখা হয়ে যায় তাদের। পথের মধ্যে যত লোকের সঙ্গে দেখা, ততজনেরই সঙ্গে

কথা হতে থাকে দাত্বর। নিজে যে খুব-কিছু বলে তা অবশ্য নয়, মন দিয়ে সে শুধু অন্যদের কথা শোনে, আর দু-একটা হুঁ-হাঁ করে মুখে। এমনি করে চলতে চলতে বাজারে যদি-বা পৌঁছানো গেল একসময়ে, কোনো-একটা দোকানে জমিয়ে বসতেই দোকানি হয়তো বলতে শুরু করল : 'আর কইয়েন না কত্তা, দিনকাল যা পড়ছে—?'

একটু পরে হয়তো কেনা হলো দুকুড়ি রুপোলি সরপুঁটি মাছ। ভরাট খালুইটা হাতে দিয়ে দাত্ব বলে : 'যা, দিয়ে আয় বাড়িতে। দৌড়ে আসবি আবার।'

রঞ্জুদাকে নিয়ে খুশিতে দৌড় লাগায় নীলু। রান্নাঘরে মাছ ঢেলে দিয়েই শুরু করে আবার উলটো দৌড়। 'আরে শোন্ শোন্' পিছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে মা বা মামিরা কেউ, 'যাস্ কোথায় আবার?' কিন্তু সেকথা শোনার আর সময় নেই তখন। দাত্ব হয়তো আরেক মেছোর কাছে বাছাই করছে ঘনকালো কৈ, গিয়ে ধরতে হবে তাড়াতাড়ি।

এবার রঞ্জুদা নেই, কিন্তু মজার এই দৌড়গুলো তো আছেই কপালে লেখা। কী মাছ খাব এবার, ভাবতে ভাবতে নীলু হাঁটতে থাকে দাত্বর পাশে।

পথে দেখা হয়ে গেল এবার ঘোষের বাড়ির মাধবমামার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে যায় দাত্ব। বলে : 'আছ কেমন? যাও না তো অনেকদিন।'

'আর যাওয়া! খুড়ামশাই, কী ঠিক করলেন?'

'কিসের ঠিক?'

'কইলকাতার দিকে যাওয়ার?'

'কোথায় যাব কলকাতায়?'

'সে তো ঠিক কথা। যাওয়ার তো জায়গা নাই কারোরই। কিন্তু যাওনও তো দরকার।'

'কেন? দরকার কেন?'

'দরকার না? থাকপে কে আর এহানে? ছ্যাহেন না, বড়োবাড়ির থিকা চইলা গেছে হগ্‌গলে, পালের বাড়ি ব্যাবাক ফাঁকা, দত্তেরাও যাই-যাই করে। ঠাকুত্তা-বাড়িতেই-বা কয়জন আছে। ওই ক্যাবল জইন্তা আর গোপাইল্যা, আর তো নাই কেউ।'

যাক, জন্তিমামা আছে তাহলে! নীলু ভাবে। দাদু কোনো কথা বলে না আর, গম্ভীর মুখে শুধু মাথা নাড়ে। ততক্ষণে যেন নীলুর ওপর চোখ পড়ে মাধবমামার। বলে: 'নীলাই না? আইলি কবে? লম্বা হইছ না কি, এট্টু? মনে লয় য্যান্?'

আবার বাজারের দিকে এগোতে শুরু করে তারা। দাদু একটু আপন মনে বলতে থাকে: 'পাগল, পাগল হয়ে গেছে সব।' কথাটা তো নীলুকে নয়, নীলু তাই বলে না কিছু। কিন্তু ভাবে, কার বিষয়ে বলল দাদু? মাধবমামা, না কি পালের বাড়ির সবাই? সবাই চলে যাবে পালের বাড়ির?

পথে চলতে চলতে কেউ বলে 'পেন্নাম কত্তাবাবু', কেউ বলে 'ভালো না তো সব হরিজ্যাঠা?' কেউ-বা বলে 'ফুলবৌ এহন আছে ক্যামন দাদা?' সবাইকেই একটু একটু উত্তর দেয় দাদু। নিতাই দত্ত বলে: 'আচ্ছা, একখান কথা কই দাদা, কইলকাতায় গিয়া এট্টু দ্যাখাইলে ভালো হইত না, ফুলবৌরে? যা শুনি, বড়ো না কি বাড়াবাড়ির দিকে, না কী?'

'একটু বেশি শোনো। তেমন কিছু না।'

'অ। তা হেইডা ভালো। তেমন কিছু না হইলেই ভালো। আমার বৌমায় কইতেআছিল কি না, হেইতেই আমি ভাবলাম কা না কী।'

দাদু বোধহয় কথাটা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যই বলল একবার: 'তোমরাও না কি এখন যাওয়ার কথা ভাবো?'

সেকথার উত্তর না দিয়ে নিতাই দত্ত বলে: 'মনের আর দোষ কী

কয়েন। একদিকে মাইয়াডারে খাইল, অইন্য দিকে কান্নুডাও ছ্যাহে না—'

দাদু তখন হাঁটতে শুরু করে আবার। বাইরের লোকেরা কেউ ফুলমামিকে নিয়ে কথা বলে, এটা দাদুর পছন্দ না একেবারে। নীলু অবশ্য বুঝতে পারে কী বলতে চাইছিল ওই লোকটা। তাদের ভারি ফুটফুটে একটা বোন হয়েছিল ফুলমামির কোলে, ছ-মাস হতে না হতেই আবার কেমন করে চলে গেল সে। আর ফুলমামা—সেকথা ভাবলে নীলুর রাগ হয়ে যায় খুব—ফুলমামা কতদিন যে আসেই না আর বাড়িতে, খোঁজও করে না কিছু। হঠাৎ হঠাৎ শোনা যায় যে আসামে ডিব্রুগড়ের কাছে কোথায় না কি আছে, কখনো-বা শোনা যায় বিহারে, ভাগলপুরের কাছে। কিন্তু কেন যে বিহারে-আসামে ঘুরে বেড়ায় শুধু, কী-বা করে সেখানে, সেটা জানতেও পারে না কেউ। সন্ন্যাসী হয়ে গেল না কি? সন্দেহ করে অনেকে। কিন্তু নীলু বুঝতে পারে না, বিহার বা আসাম কি তবে সন্ন্যাসীদের জন্য বিখ্যাত?

বাজারে পৌঁছবার অল্প আগে, লাইব্রেরি-বাড়িটার ঠিক আগের একটা বাড়ি দেখিয়ে প্রতিবারই দাদু একবার বলবে: 'এই-যে, তোদের বাড়ি!' আর, কথাটা শুনলেই নীলুর বেশ মনখারাপ হয়ে যায়। কেন, তোমাদের বাড়িটা কি তাহলে আমাদের বাড়ি না?

আসলে, নীলুর ঠাকুর্দা-ঠাকুমারা থাকতেন এর কাছেই, তাঁরা এখন আর বেঁচে নেই কেউ। তার কাকা-পিসিও নেই কেউ। 'জ্ঞাতি-কুটুম্ব তো আছে অনেকে' মা বলে মাঝে মাঝে, 'কিন্তু থাকা যায় না কি ওদের সঙ্গে?' সেইজন্য, নীলুদের থাকবার একটা আলাদা আস্তানা বানাতে শুরু করেছিল বাবা সেই অনেক বছর আগে। চারদিকে চকচকে টিনের ঘের দেওয়া টিনের চাল দেওয়া দুখানা ঘর প্রায় তৈরিই হয়ে গিয়েছিল, শুধু দরজা জানলা লাগানোটাই বাকি। একটা সময় ছিল, নীলুরা যখন

আধা-গর্বে আধা-দুঃখে বলত : এর পরের বার আমরা এইখানে এসে থাকব। নীলুর পক্ষে এটা বেশ সুখেরই কথা যে জীবনে সেই পরের বারটা আর এলই না কখনো, ঠিক একইভাবে ওইরকম পড়ে ছিল ওটা বছরের পর বছর, বছরের পর বছর। ছোটোবেলা থেকে বাড়ি বলতে তারা তো তাই তাদের এই মামাবাড়িকেই বোঝে!

লাইব্রেরির পাশ দিয়ে যেতে গেলেও ওইরকম বাঁধা একটা বুলি আছে দাদুর : 'দেখছিস তো, লাইব্রেরি? আর কোনো গ্রামে পাবি এ-রকম? আমাদের গ্রামে পোস্টাপিস আছে, থানা আছে, ইটবাঁধানো পাকা রাস্তা আছে আবার লাইব্রেরিও আছে। আছে আর কোথাও? বড়ো হয়ে মনে রাখবি, মান রাখতে হবে গ্রামের।'

মানের কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না নীলু, কিন্তু লাইব্রেরিটার জন্য ভারি মায়া তার। এর সঙ্গে তাদের কতদিনের কত কথা জড়ানো। পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ে, ওই তো, ওই সিঁড়ির কাছে জমা হয়ে তারা সবাই গান গেয়েছিল আর বছরে, সামনের খোলা জায়গাটুকুতে কী-একটা সভা ছিল যেন। লাইব্রেরির নিমুকাকু এসে বলেছিল দাদাকে : 'ওরে, সবাই মিলে একটা গান গেয়ে দিতে পারবি, উদ্‌বোধনী গান? দেশপ্রেমের হতে হবে কিন্তু।'

গানের নামে দাদা তো এক পায়ে খাড়া। নীলুদের সবাইকে জড়ো করে শেখাতে লাগল একটা গান, কলকাতায় সেটার না কি খুব চল হয়েছে তখন :

শ্মশানে কি নতুন করে লাগল প্রাণের রং
সঞ্জীবনী মন্ত্র সে কী : বন্দে মাতরম্!
বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!

গান যখন বেশ ভালোরকম তোলা হয়ে গেছে সবার, নিমুকাকু সেটা শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসল। বলল : 'করেছিস কী রে!

'একেবারে বন্দে মাতরম্? এইখানে? এখন? চলবে না চলবে না, ঝঞ্ঝাট লেগে যাবে রে বাপু। জানিস না এখানে বন্দে মাতরম্ শুনলে খেপে যায় অনেকে? না না, ও-গানটা না।

আবার এখন নতুন করে গান তুলবার সময় আছে না কি? মুশকিল তো!

দাদা কিন্তু বলল: 'ঠিক আছে, ওই গানই হবে, বন্দে মাতরম্ না থাকলেই হলো তো?'

অল্প একটু পালটে নিয়ে ওই গানটাই নীলুরা সবাই মিলে গেয়েছিল সেদিন:

শ্মশানে কি নতুন করে লাগল প্রাণের রং
সঞ্জীবনী মন্ত্র সে কী, জাগল সবার মন!
জাগল সবার মন! জাগল সবার মন! জাগল সবার মন!

দাদার এই ঝট করে পালটে দেবার প্রতিভা দেখে সেদিন অবাক হয়েছিল নীলু। আর, বন্দের ওই ধুয়োটায় ফিরে ফিরে আসছিল ওরা, সবাই সবার চোখে চোখে তাকিয়ে হাসছিল মিটিমিটি, কেননা অন্যেরা কেউ বুঝতেই পারেনি কিছু।

লাইব্রেরির সিঁড়ির স্মৃতিটুকুই তো সব নয়। বই? বইয়ের কথা? পুজোর সময়ে বাড়িতে এলেই চিলেকোঠার জানলার ধারে শুয়ে শুয়ে অনেক বই পড়েনি নীলু, ওই লাইব্রেরি থেকে নিয়ে? এই তো আর বছরেই এমনি দিনে পেয়েছিল একটা বই 'তুর্কী বীর কামাল পাশা'। বইয়ের লেখকের নামটাও কেমন করে গেঁথে গেছে তার মনে, রেজাউল করীম। পড়তে পড়তে অন্য একটা দেশের ছবি দেখতে পাচ্ছিল বলে এত ভালো লাগছিল তার! কানে বাজছিল ইস্কুলের বাংলা বইতে পড়া অন্য একটা কবিতার লাইন 'কামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই'।

অবশ্য এ-লাইব্রেরি থেকে, সত্যি বলতে, নীলু সবচেয়ে বেশি পড়েছে

নাটকের বই। আঃ, সে কী নেশা। সেজোমামা যতই নাটক পছন্দ করে ততই সেটা অপছন্দ মেজোমামার। সেইজন্যে পড়ার জায়গা হিসেবে চিলেকোঠাটা বেছে নিয়েছিল নীলু, মেজোমামা ওখানে যায় না কখনো। ওইখানেই উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই সে পড়েছে 'গৈরিক পতাকা' 'সাজাহান' 'মহারাজ নন্দকুমার' 'সিরাজউদ্দৌলা'। বই পড়ে দেখে, ও বাবা, এটা তো আরেক সিরাজউদ্দৌলা, আরেকরকম! রেকর্ডে যেমন শুনেছে, ঠিক তেমন তো নয়! নীলুর অবশ্য নির্মলেন্দু লাহিড়ীর গলাকাঁপানো সেই আটখানা রেকর্ডের 'সিরাজউদ্দৌলা'ই ভালো লাগে বেশি। এতবার সেটা শুনেছে যে পুরোটাই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তার। 'বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান্ অধিপতি, তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি জনাব'— সিরাজের এই প্রথম কথাটা থেকে শুরু করে একেবারে শেষ রেকর্ডে আলেয়ার গাওয়া 'পলাশি, হায় পলাশি' পর্যন্ত এক নিশ্বাসে বলে যেতে পারে নীলু, গলা উঠিয়ে-নামিয়ে।

তার মুখে শুনে শুনে নেশা হয়েছিল হারুনেরও। কথা হয়েছিল যে একসঙ্গে ওরা একবার অভিনয় করবে ওটা। কথাটা সেজোমামাকে বলতেই সেজোমামা বলেছিল: 'হারুন? ও তো মহামুখ্যু। থিয়েটার করবে কী, ও তো ঠিকমতো কথাই বলতে পারে না!'

ইস্কুলে পাঠশালায় পড়েনি হারুন। তাই বলে কি মহামূর্খ বলাটা উচিত হয়েছে সেজোমামার? কথাটা কানে গিয়েছিল হারুনেরও। নীলুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল: 'আরে দূর, না করাইল তো না করাইল। বাইচ্যা যদি থাকি, করুমই একদিন ওই থিয়েটার। আমি হমু গোলাম হোসেন, তুই সিরাজ। কী, হবি তো?'

'এই, আরে এই নীলাই, কথাটা যে কানেই যায় না!' —দাদুর গলা শুনে চমক ভাঙে নীলুর। তারা তখন একেবারে মাছের বাজারের মধ্যে।

লম্বা লম্বা গাব্‌দাগোব্‌দা গল্‌দা চিংড়িতে ভরে আছে খালুইটা, এখানে সবাই বলে ইচামাছ। মেছোর সামনে উবু হয়ে বসে আছে দাদু, বলছে : 'যা, এগুলি দিয়ে আয় তাড়াতাড়ি, ফিরতে যেন দেরি করিস না আবার—'

দৌড় শুরু করে নীলু, পোল পেরিয়ে, লাইব্রেরির পাশ দিয়ে, একেবারে ইটবাঁধানো রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে।

৬

নীলুদের কাছারিঘরটাকে যে কাছারিঘর কেন বলা হয়, সেটা একটা মস্ত ধাঁধা। মণ্ডপের ঠিক উলটোদিকে টিনের চালার লম্বামতো একখানা ঘর. তিনদিকে দরমার ঘের। সামনের দিকেও ডাইনেবাঁয়ে অল্প একটু দরমা. মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা। বেশ সুবিধেই তাতে, ওইখানে একটা পর্দা টাঙিয়ে নিলেই বেশ একটা স্টেজ হয়ে যায়। এইরকম স্টেজ বানিয়ে নিয়ে সেজোমামা তাদের দিয়ে কতই-না থিয়েটার করিয়েছে। মণ্ডপের দিকে পিছন ফিরে খোলা চত্বরে বিছানো সতরঞ্চির ওপর বসে যায় লোকেরা, আর সেজোমামার হুকুমদারিতে নীলুদের দলবল সাজ-পোশাক পরে দাপাদাপি করে ওই ঘরটায়, এ-রকম কত হয়েছে। রং-বেরং-এর ঝলমলে সাজপোশাকে বোঝাই দুটো ট্রাঙ্কও আছে সেজো-মামার। কত কিছুই আছে তার মধ্যে—পরচুলা, জরিবসানো শাটিনের জামা, কোমরবন্ধ, স্প্রিং লাগানো ছোরা!

এই তো তাহলে কাছারিঘরের কাজ। না, কাজ অবশ্য আরো আছে। পুজোর সময়ে ওইখানে এসেই তো ঢাকিরা থাকে, তাদের ঢাকঢোল কাঁসর নিয়ে। অনেক সময়ে ওখানে দাঁড়িয়েই তো বাজনা বাজায় তারা।

অষ্টমীর বলি শেষ হয়ে গেছে। বলির বাজনাও তাই শেষ। ঢাকিরা কোথায় চলে গেছে, ঢাক ঢেকে রেখে। দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকখানি, কিন্তু রান্নাঘরে মায়েদের খাওয়ার পাট চুকতে দেরি আছে, সেজোমামারই

খাওয়া হয়নি এখনো। দিদিমা তাই রাগ করে দূত পাঠিয়েছে নীলুকে।

কাছারিঘরের এক কোণায় একটা চৌকির ওপর বুকের নিচে একটা বালিশ দিয়ে, উপুড় হয়ে সেজোমামা যে কিছু-একটা লিখছিল বা পড়ছিল, সেটা নীলু দেখে গেছে অল্প আগে। দিদিমার তলব নিয়ে সে এসে দাঁড়াল সেই কোণায়।

সেজোমামা একবার তাকাল তার দিকে, কিন্তু দেখল কি না বোঝা গেল না। বাঁ হাতে গোঁফের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে ডান হাতের পেন্সিলে খাতার ওপর কী যেন একটা ছবি আঁকছে সেজোমামা। অবশ্য ওকে ঠিক ছবি বলা যাবে না। ছোটোবড়ো নানারকম চৌকোমতো খোপ কাটা. এক-একটা খোপের ওপর অনেকবার দাগা বুলোচ্ছে সেজোমামা. আর মাঝে মাঝে মিটিমিটি হাসছে।

'খেতে ডাকছে তোমাকে'—খবর দেয় নীলু।

'দাঁড়া দাঁড়া গোলমাল করিস না। ব্যস্ত আছি দেখছিস না?

নীলুর মনে কৌতূহল জমা ছিল একটু। চৌকির ওপর সেজোমামার পাশে বসে বলল: 'কিসে ব্যস্ত আছ? খাতায় তো শুধু আঁকিবুঁকি কাটছ।'

'আঁকিবুঁকি? বুঝবে, বুঝবে। সবাই একদিন বুঝতে পারবে কাকে বলে আঁকিবুঁকি। বুঝছিস না তুই? দেখ্ ভালো করে। কী, বুঝতে পারছিস কিছু?'

নীলু খুব মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু খোপের মধ্যে খোপ, তার মধ্যে খোপ—এ ছাড়া কিছু তো আর বোঝা যায় না। একটু হেসে বলে: 'একটা ধাঁধা আছে-না, ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতরে—'

'বাঃ বাঃ, তবে তো বুঝেইছিস।'

'কী বুঝলাম? বা!'

'ওই-যে বললি ঘরের ভিতর ঘর। হ্যাঁ, ওইটাই কথা। এ হলো

ঘরের ছবি। দেখ্‌ ভালো করে। এই হলো আমাদের বাড়ির ছবি।'

'বাড়ির ছবি?' চারপাশটাকে এবার খুব ভালো করে দেখে নেয় নীলু। তারপর বলে: 'কোথায় আবার বাড়ির ছবি? বাড়ি যদি, খাল-পাড় কই তবে? পুকুর কই? আমাদের দালানটা কি এইরকম? রান্নাঘর কোন্‌টা? মণ্ডপ কোন্‌টা?

'আরে দূর বোকা। এটা এই বাড়ির কথা না।'

'তবে কোন্‌ বাড়ির কথা?'

'এ হলো আমাদের কলকাতার বাড়ি।'

'কলকাতার বাড়ি? মানে? কলকাতায় আবার আমাদের বাড়ি আছে না কি?'

'নেই, এখনো নেই। হবে। সেইটাই তো কথা। কলকাতায় আমাদের বাড়িটা যে-রকম হবে, এই হলো তার নকশা। এইবার বুঝলি হাঁদারাম?'

ভবিষ্যতের ওই নকশার কথা শুনে এতই উত্তেজনা হলো নীলুর যে 'হাঁদারাম' শব্দটাকে আর গ্রাহ্যই করল না সে। আরো ঝুঁকে পড়ে বলল: 'তাই? দেখি তো কী-রকম বাড়ি এটা?'

নকশার ওপর পেন্সিল ঘোরাতে ঘোরাতে সেজোমামা তখন বোঝাতে থাকে নীলুকে: 'এই দেখ্‌, এটা কী বুঝতে পারছিস তো? এইটা হলো একতলার উঠোন, পুজোর সময়ে এইখানে দাঁড়িয়ে ঢাকিরা ঢাক বাজাবে। আর সামনে এটা কী দেখছিস? এটা? এই হলো পূজাদালান। এক-তলা হলে কী হবে, এই একতলার মণ্ডপে উঠতেই দেখবি অনেকগুলি সিঁড়ি লাগবে—'

'ঘোষের বাড়ির মতন?'

'আরো, আরো উঁচু। এইগুলি, এই-যে দাগগুলি, এই হলো সিঁড়ি।'

'কতগুলি সিঁড়ি?'

'কতগুলি ? এই ধর্‌—আচ্ছা কটা হলে ভালো হয় বল্‌ তো ? দশটা না পনেরোটা ?'

'পনেরোটা হলে বোধহয় বেশি উঁচু হয়ে যাবে। ঢাকিরা তো ঠাকুরকে আর দেখতেই পাবে না নিচ থেকে।'

'আরে দূর, ঢাকিও কি একেবারে নিচের উঠোনে দাঁড়াবে না কি ? ওটাও উঁচু হবে না ? ওখানেও একটা নাটমন্দির-মতো থাকবে না ? তা থাকবে। তবু, পনেরোটার দরকার নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, দশটা সিঁড়ি।'

'খুব লম্বা লম্বা সিঁড়ি, না ?'

'বাঃ, লম্বা তো হতেই হবে। কত লোক আসবে, বসবে, দাঁড়াবে! লম্বা হতেই হবে।'

'আচ্ছা এগুলি কী সেজোমামা ?'

'এগুলি ? বুঝলি না ? এ তো এক-একটা তলা।'

'উরিব্বাস, কত তলা বাড়ি এটা ?'

'দেখছিস না, পাঁচতলা ?'

'পাঁচতলা কেন ? অত কী হবে ?'

'হবে না ? বাঃ, আমরা পাঁচ ভাই, আর তোর মা। তাহলে হলো ছজন। সবাই মিলে থাকতে হলে—'

'সবাই মিলে ? সবাই আমরা একসঙ্গে থাকব ? সত্যি ? সোনাদি রঞ্জুদা ঝুম্পু আলো—সব ?'

'থাকব না ? বাঃ, তাহলে যাব কোথায় ? আমাদের তো এখান থেকে চলেই যেতে হবে। সবাইকে। শুধু তো এখান থেকে না, কুষ্টিয়ায় চাঁদপুরে পাকশিতে তোরা যে যেখানে আছিস সবাইকে তো চলে যেতে হবে অন্য জায়গায়। তাই কলকাতাতেই যাব সবাই, গিয়ে বেশ একটা মজা হবে, সবাই এক জায়গায় একসঙ্গে থাকা হবে, বছরে একমাস নয়,

সারা বছর জুড়ে, প্রত্যেক দিন।'

এই কথাটা নীলুর বেশ পছন্দ হলো। আঃ, সবাই একসঙ্গে থাকা সব সময়ে? সেটা একটা দারুণ ব্যাপার। পঁচিশজনে একসঙ্গে খাওয়া। কিন্তু তাও যদি হয়, তবু, পাঁচতলা কেন। 'পাঁচ কেন, সেজোমামা?'

'এক-এক তলায় দুজন।'

'তাহলে তো তিনতলাতেই ছজনের হয়ে গেল।'

'নিচের তলায় তো থাকছে না কেউ।'

'তাও তো বাকি রইল একটা।'

'বাঃ. দাদু দিদিমার কথা ভুলে গেলি? আর তাছাড়া, ওই যে তোর মা-মামিরা বলে আইস-জন বইস-জন, তাদেরও কথা তো ভাবতে হবে? না কী? কী বলিস?'

নীলুর মনে হয় কথাটা ঠিক। কিন্তু এত আইস-জন বইস-জন পাওয়াই বা যাবে কোথায়! কলকাতায় তাদের কেউ চিনবে না কি? জিজ্ঞেস করে নীলু: 'কে-বা আসবে কলকাতায়. আমাদের বাড়িতে? চেনে কেউ আমাদের?'

'বাঃ. এই গ্রামের লোকেরা সব থাকবে না তখন কলকাতায়?'

'থাকবে সবাই?'

'বা রে, না থাকলে হবে? সবাইকেই থাকতে হবে। পাশাপাশি সবার বাড়ি থাকবে—সব্বার। কলকাতার মধ্যেই আমাদের গোটা গ্রামটাকে দেখতে পাবি তখন, বুঝলি? কী বুঝলি?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু তেমনি, খালটাকে তো আর পাবে না সেখানে। আর পুকুর? আর ওই-যে ঝুমকোজবা, স্থলপদ্ম, শিউলিফুলের গাছগুলি? সেগুলি পাবে কোথায়?'

সেজোমামা এবার একটু ভাবে। তারপর বলে: 'নাঃ, ওগুলি পাওয়া যাবে না তা ঠিক। তা, সবই কি আর পাওয়া যায়? ওই-যে বলে না,

সর্বনাশ এলে অর্ধেকটা ছাড়তে হয় ?'

তারপর গলার স্বর একটু পালটে নিয়ে বলে : 'এখন যা, তোর মাকে গিয়ে বল্, এখন থেকে যেন পায়ের তলায় ভালো করে সরষের তেল মাখিয়ে হাঁটা প্র্যাকটিস করায় সবার।'

অবাক হয়ে যায় নীলু। 'হাঁটা প্র্যাকটিস ? সে আবার কী ?'

'বাঃ, এই-যে বাড়ি দেখছিস, এর মেঝেটা হবে কেমন ? একেবারে ঝকঝকে, শ্বেত পাথরের। এমন ঝকঝকে যে হাঁটতে গেলে পিছলে যাবে পা। সে-রকম পিছল মেঝের ওপর হাঁটার জন্য অনেক আগে থেকে অভ্যেস করতে হবে না ?'

'না-করলেই হয় অত পিছল।'

'না না, তা হয় না। পিছল করতেই হবে, পিছল তো করতেই হবে। একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। হাঁটতে গেলেই পড়ে যাবে সবাই, দেখিস তখন মজা।'

নিজেদের বাড়িতে পা পিছলে পড়ে যেতে থাকলে এত মজা কিসের, নীলু ঠিক ধরতে পারে না সেটা। কিন্তু সেজোমামা ততক্ষণে চৌকির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে গোঁফে হাত বুলোতে থাকে আপন মনে। নীলুর মনে হয় আর এখানে বসে থাকা ঠিক না। 'এসো তাড়াতাড়ি, দিদিমা কিন্তু রেগে গেছে খুব' বলে রান্নাঘরের দিকে দৌড়োয় নীলু। গিয়ে খবর দেয় : 'সেজোমামা এখন ব্যস্ত। বাড়ির ছবি আঁকছে।'

'কী আঁকছে ?'

'বাড়ির ছবি। কলকাতায় আমাদের যে পাঁচতলা বাড়ি হবে, সেই ছবি।'

শুনে বড়োমামি হেসে কুটিপাটি হলো। মা মুখ টিপে হেসে বলল : 'এই এখন চলবে কিছুদিন !' আর দিদিমা গেল খেপে। বলল : 'অনেক কষ্টে যাও-বা একটা কাজ জোগাড় করা হলো এত বয়সে, ছেড়ে দিল

সেটাও। বলে কি না ব্যাবসা করবে। আরে, অতই সোজা ব্যাবসা করা? সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ানো পথেঘাটে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, আর ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা। দেখ্ তো খুকি, টেনে আনতে পারিস কি না।'

হাসিমুখে মা চলল কাছারিঘরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে গেল নীলুও। বলল: 'আচ্ছা মা, তোমরা কেন ফুলমামিকে এত পাগল-পাগল বলো? ফুলমামি কি সেজোমামার চেয়েও বেশি পাগল?'

৭

পুজোর দিনের সন্ধেগুলোর সঙ্গে জস্তিমামার নামটা জড়ানো থাকে সব সময়ে। ঠাকুরতাবাড়ি থেকে জস্তিমামাকে ধরে না আনলে মণ্ডপের আলোই জ্বলবে না মোটে।

সব কাজের জন্যই লোক ভাগ করা আছে যেন : গণেশকে কোঁচা ঝুলিয়ে আর অসুরকে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরাতে হবে? কলাবৌয়ের শাড়ি? পাশের বাড়ি থেকে ডেকো আনো কেষ্টমামাকে। আরতি হবে? ডেকে আনো উত্তরের বাড়ির ফটিককাকুকে। বলি? তার জন্য তো আছে অনন্ত। আর, আলো জ্বালাবার জন্য এই জয়ন্ত ঠাকুরতা।

আজ অষ্টমীর সন্ধ্যাতেও জ্বালানো হয়ে গেছে বড়ো একটা পেট্রোম্যাক্স —সবাই বলে ডে-লাইট—কী-রকম একটা শাদামতো আলো হয়! জস্তিমামা যখন ওটা জ্বালবার জন্য পাম্প করছিল, আর ছোট্ট শাদা ঝোলানো জালটা আলোয় ভর্তি হয়ে ফুলে উঠছিল, প্রথমে সোনালি আর পরে রুপোলি একটা বলের মতো, জস্তিমামাকে মনে হচ্ছিল যেন ম্যাজিশিয়ান!

আলো জ্বালিয়ে চলে গেছে জস্তিমামা। আরতির দেরি আছে এখনো। নীলুকে ডেকে দিদিমা বলছে: 'কই রে, নিয়ে যাবি না আমাকে?'

দিদিমাকে কখনোই বাইরে বেরোতে দেখে না নীলুরা, কিন্তু মহাষ্টমীর

সন্ধ্যায় তাকে বেরোতেই হবে। কেননা, এই অষ্টমীতে না কি দিদিমাকে ঘুরে ঘুরে দেখতেই হবে আটখানা প্রতিমা। কে যে কবে এই নিয়মটা ঠিক করেছিল, সেটা বলতে পারে না কেউ, দিদিমাও না। কিন্তু এ-নিয়মের এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। সবাই মিলে ঘটা করে তাই বেরোনো হয় পথে।

মা বড়োমামি আর দিদিমাকে নিয়ে চলল এবার নীলু, একা। 'ফুল-মামি কি যাবে?' এটা জিজ্ঞেস করতেই দিদিমা এমনভাবে তাকাল যে দুবার বলবার আর ইচ্ছে হলো না তার। বড়োমামা শুধু দূর থেকে বলল একবার: 'যাচ্ছ-যে, আটখানা প্রতিমা খুঁজে পাবে তো এবার?'

সেকথা অবশ্য সত্যি। অন্য বছরগুলোয় এ নিয়ে কতই জল্পনা হয়, কত নির্বাচন, পছন্দ-অপছন্দ। 'জানিস তো, পালের বাড়িতে এবার পাহাড় করেছে, একেবারে কলকাতার ঠাকুরের মতো, পাহাড় থেকে নেমে আসছে ভগবতী!' নয়তো, 'কবিরাজবাড়ির লক্ষ্মী-সরস্বতীর চোখ দুটো কী সুন্দর হয়েছে না? কী-রকম টানা-টানা চোখ, ভাসা-ভাসা চাউনি!' নয়তো 'কী সুন্দর শোলার সাজ দিয়ে সাজিয়েছে বড়োবাড়ির ঠাকুর, আর চালচিত্তিরটা কী বড়ো!'—এইসব হিসেব নিয়ে ঠিক হয় কোথায় যাবে আর কোথায় যাবে না। কিন্তু এবার তো সত্যি অত বাছাই করবার দরকার হবে না, সবচেয়ে কাছের বেনেবাড়িতেই তাই তারা রওনা হলো প্রথমে।

'ফতেমাটা এল না এবার।' পথে নেমেই একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব নিয়ে কথাটা বলল দিদিমা।

মা জিজ্ঞেস করল: 'আসে তো মাঝে মাঝে? না কি একেবারেই আসে না আর?'

'আসে। আসে ঠিকই। তবে মনে হয় যেন আগেকার সেই তাপ-উত্তাপ আর নেই।'

হাঁটতে হাঁটতে একটু পরে আবার বলল দিদিমা : 'মাথা উঁচু করে একেবারে চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলে এখন, এখন কি আর ওদের সেইদিন আছে ? এখন তো ওরাই সব।'

কেউ আর বলল না কিছু, কিন্তু নীলুরও মনটা ভাবনায় দুলছিল অনেকক্ষণ ধরে। ফতেমা হলো হারুনের মা। মহাষ্টমীর সন্ধ্যাবেলায় হারুন আসেই আসে প্রতিবার, তার মা এসে বসে থাকে উঠোনে আর হারুন থাকে নীলুর সঙ্গে। তারপর যখন তাদের বাড়ি থেকে খুদে একটা মিছিলই বেরোয়—আটখানা ঠাকুর দেখবার মিছিল—তখন সেই দলের মধ্যে প্রতিবারই থাকে হারুন আর হারুনের মা। এবার পুরো দুদিন হয়ে গেল নীলুরা এসেছে, কিন্তু এর মধ্যে একবারও হারুনের টিকিটি দেখা গেল না। অবশ্য, সে নিজেও তো খোঁজ নিতে পারত। বাঃ, কেন, আমার বুঝি রাগ থাকতে নেই ? আমরা তো শুধু এক মাসের অতিথি হয়ে আসি। তোমরা যারা এখানে বচ্ছর ভরে থাকো, তোমরা এসে আমাদের একটু খোঁজখবর করবে না ? ঠিক আছে, হারুন যদি খবর না নেয়, আমিও আর দেখা করছি না এবার। দেখা যাবে কার কত জেদ।

বেনেবাড়ি ঢুকবার মুখেই আবার দেখা হলো সেই নিতাই দত্তের সঙ্গে। লোকটা কি সব সময়ে সব জায়গায় থাকে ? ভারি মুশকিল তো। দিদিমাকে দেখেই বকবকম শুরু করল আবার : 'এই-যে, বৌঠান যে, আছেন ক্যামন ?'

'আছি, ভালো আছি।'

'অ, তা ভালো থাকলেই ভালো। খুকি বুঝি ? আর এইডা খুকির পোলা ? হ, দেখা হইছিল কাইল, দাদার লগে বাজারে যাইতে আছিল। আর ওইডা, বড়ো-বৌ না কি ? বেশ, বেশ। মাইজ্যা-বৌ আয় নাই এইবার ?'

দিদিমা সংক্ষেপে বলে : 'নাঃ। ঝঞ্ঝাট তো!'

'হ হ, তা তো ঠিকই। কিন্তু ফি-বছর সব বৌমারে লইয়া আপনে যখন বাইরায়ন, আপনেরে গ্যাখতে লাগে য্যান্ জগদ্ধাত্রী। মাইজ্যাবৌ আয় নাই, আর কপাল, ফুলবৌ তো থাইক্যাও নাই—'

'না, ভালোই আছে এখন—'

'না কি? তা ভালো। ভালো থাকলেই ভালো। তয় লোকে তো নানান্ কথা কয়, সেইডা কইতে আছিলাম। যখন-তখন না কি আন্দাড়ে-বান্দাড়ে ঘুইর‍্যা বেড়ায়, একলা, মাইয়ামানুষ—'

দিদিমার হাত টেনে মা বলল: 'দেরি হয়ে যাবে তো, চলো এগোই।'

'যাবাই তো, যাবাই তো। তা, এদিকে বিশু যে ফির‍্যা আইছে, খুকি শোন্‌ছ তো?'

দিদিমার হাত ধরে মা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, এই শেষ কথাটা শুনে ফিরে দাঁড়াল আবার।

'কে? কে ফিরে এসেছে?'

'আরে বিশু, বিশু। বিশুরে মনে নাই তোমার? পোলাপান-কালে তোমরা তো খেলাধুলা করতা খুব! হেই বিশু।'

'বিশুদা ফিরেছে?'

'ফিরছে ফিরছে, এই তো কয়দিন হইল। বাইরায় না অ্যাহোন বেশি। আঃ, কী চেহারাডারে কী করছে! হাজতের মইধ্যে পিডাইয়া পিডাইয়া তো আর রাহে নাই কিছু। তহনই কইছিলাম, পই পই কইর‍্যা কইছিলাম, এই সবের মইধ্যে যাইস না রে ছ্যামরা। তা কথাডা কি শোনল একবারও? আরে, ইংরাজগো লগে লাগা, সেইডা কি খেলা-খেলা কথা না কি? অ, যাও গিয়া না কি তোমরা? আইচ্ছা যাও, যাও। দশরার দিন যামু হ্যানে তোমাগো বাসায়, কইয়ো হরিদাদারে—'

দিদিমা মা বড়োমামি তখন এগিয়ে গেছে অনেকটা। অবাক হয়ে নীলু দেখে নিতাই দত্ত পিছন থেকে বলেই চলেছে কথা। তাড়াতাড়ি পা

চালিয়ে সে-ও গিয়ে দাঁড়াল মায়েদের পাশে, মণ্ডপের সামনে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বড়োমামি শুধু বলল মাকে : 'অসুরটা তো বেশি ভালো হয়নি দেখি। ওইখানে দত্তমশাইকে বসিয়ে দিলে হতো না?'

দিদিমা এখন ওখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে জপ করবে কিছুক্ষণ। নীলু সরে এল চৌকোনা বড়ো নাটমন্দিরের ওপর। শাদাকালো পাথর দিয়ে বাঁধানো চত্বর, ওপর থেকে ঝুলছে কয়েকটা ঝাড়লণ্ঠন, ওপরের চার-পাশটা নীল-লাল-সবুজ-হলুদ কত রকম কাচের ঢাকনা দেওয়া ঘের, আর কোণে কোণে কবুতরের আস্তানা। বেনেবাড়ির ঢাকগুলো বাজানো হয় এখান থেকে, চারপাশে দালানের ঠাসা ঘের থাকার জন্য ঢাকে কাঠি পড়লেই শব্দ যেন একেবারে গম্‌গম্‌ করে ওঠে। তাদের বাড়ির ঢাকের আওয়াজ অনেকটা ফিকে হয়ে যায় খোলা হাওয়ায়, আর এখানকার শব্দটা যেন দেয়ালে-দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ভারী হয়ে ওঠে, এখন যেমন হচ্ছে।

দিনের বেলায় এখানে এলে, শিউলি আর পদ্মফুলের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ওইসব কবুতরের ওড়াউড়ি, আর নীল-লাল কাচ থেকে ঠিকরে পড়া হালকা-রোদে নীলুর মন একেবারে অবশ হয়ে আসে। ঠিক কী রকম, তা বোঝানো যায় না কাউকে। গত বছরে হারুনের সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে সেই কথাটা বলতেই কেমন উলটো বুঝে হারুন বলেছিল, হঠাৎ : 'এইসব একদিন আমাগো হইয়া যাইবে।'

'মানে?'

'কায়েদে আজম কইছে, এই সব আমরাই পামু।'

'তোরা? তোরা মানে? কারা তোরা?'

'আমরা মানে মোছলমানেরা।'

'বলল কে তোকে?'

'আমার এক চাচায় থাকে বইশ্‌শালে, হেই চাচায় কইছে : কইছে

যে এই সব আমাগো, সব, সব—'

শুনে খুব রাগ হয়েছিল নীলুর। কিন্তু এক বছর পর এখন তো মনে হয় ঠিকই বলেছিল হারুন, হারুনের চাচা, কিংবা কায়েদে আজম। এটা আমাদের, এটা ওদের, এইভাবেই তো এখন কথা বলে সবাই।

হঠাৎ নীলুর বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। আচ্ছা, হারুন যে তবে এল না এবার, একবারও। সে কি এইজন্যে? সব কিছুতেই এবার 'আমরা' আর 'ওরা' হয়ে গেছে বলে? সোনাদির সেই অনেক দিনের পুরনো বিশ্রী কথাটা তার কানে যেন ভেসে এল আবার—'ওরা তো বাঙালি না, ওরা মুসলমান!' সেইজন্য?

না, কাল সকালেও যদি হারুন না আসে, তাহলে নিজেই সে যাবে ওদের বাড়ি। বুঝতে হবে ব্যাপারটা।

দিদিমা বলল : 'চল্‌রে এবার কোন্ দিকে যাবি—'

৮

এবার নবমীর দিনেও সেই একটাই মাত্র ঢাক, একটাই মাত্র কাঁসর। অন্য সব বছরে এই দিনটায় কী ধুম লেগে যায়! পালের বাড়ির দত্ত বাড়ির বেনে বাড়ির ঘোষের বাড়ির সব মিলিয়ে অন্তত নটা ঢাক তো জমেই যায় এক জায়গায়, সব বাড়িতেই এই রকম, একসঙ্গে বাজিয়ে বেড়ায় সকলে। সব বাড়িতেই জোড়াবলি, আর অনেক ঢাক মিলিয়ে একসঙ্গে যেন শব্দের ঢেউ ছড়িয়ে যায় গোটা গ্রাম জুড়ে।

নীলুর মনে পড়ে, ওই বলির সময়টায় তারা ভাইবোনেরা সবাই মিলে কেমন উঠে যেত ছাতে, কেননা ভিড় এড়িয়ে ওখান থেকে দেখা যাবে ভালো, উঁচু থেকে। দেখতে যে চাইত খুব, তা অবশ্য নয়। দেখত শুধু জটলা, আর জব্‌জবে সিঁদুরমাখা কপাল নিয়ে সিঁদুরমাখা রামদা হাতে যেই এগিয়ে আসত অনন্ত, অমনি তারা অনেকে সরে আসত পিছনে।

সেজোমামাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল নীলু: 'আচ্ছা, এই যে আমাদের দিয়ে কেবলই তুমি "বিসর্জন" নাটকটা করাও, দাদু রাগ করে না?' অবাক হয়ে সেজোমামা বলে: 'রাগ কেন করবে?' 'বাঃ, করবে না? এই যে বলি দেওয়া হয় পুজোয়, তার বিপক্ষেই বলা আছে না নাটকটায়? ত্রিপুররাজ্যে বলি বন্ধ করে দেননি গোবিন্দমাণিক্য?' 'ওঃ, সেই কথা!' কিছুই যেন নয় কথাটা, এই ভঙ্গিতে বলতে থাকে সেজো-

মামা : 'শোন্ তবে, এবার কী নাটক হবে—'

একটা ছবি খুব মনে পড়ে নীলুর। বলির সময়ে 'এ ম্যা, দূর, এ কি দেখা যায়, কী খারাপ' বলে সোনাদি তার চোখমুখ ঢেকে ফেলত দুহাতে, কিন্তু ছাতের আল্‌সে থেকে নড়তও না এক চুল। আঙুলগুলি একবার ফাঁক করে একবার বন্ধ করে, একবার দেখে একবার না দেখে, মাঝেমাঝে গলা দিয়ে একটা ভয়ের আওয়াজ বার করে বলতে থাকত 'বিশ্রী! দেখব না বাবা!' এই এক অদ্ভুত খেলা। হ্যাঁ, ভয়-ভয় খেলাই যেন মনে হতো নীলুর।

সেসব খেলা এবার নেই। ভিড়ই নেই এবার। কখন প্রায় নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেছে বলি—নবমীতে মোটে একটা ঢাকের শব্দ তো প্রায় নিঃশব্দেরই সমান। নীলুও খুব নিঃশব্দে, কাউকে কিছু না বলে, বেরিয়ে পড়ল পথে। হারুন কেন এল না একবারও, খোঁজ নিতে হবে আজ। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিন গড়িয়ে গেল, একদিনও এর মধ্যে আসবে না হারুন?

বাড়ির পিছনদিক দিয়ে পায়ে হাঁটা যে সরু পথটা আমবাগানের বুক চিরে চলে গেছে, সেইটে ধরে একটু এগিয়ে গেলেই ছোট্ট টিনের চালাটার মধ্যে থাকে হারুন। বছরে তো একবার মোটে আসা হয় এখানে, পুজোর ছুটির একমাস, সেইকটা দিন মনে হয় যেন বছর জুড়েই তাদের দেখাশোনা হবে কত, কিন্তু ফুরিয়ে যায় আবার কদিনেই। এক বছর পর এসে আবার নতুন করে ভাব জমাতে হয়।

হারুনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরো কতজনের সঙ্গে কতবার আলাপ হয়ে গেছে নীলুর, সেইটে খুব ভালো লাগত তার। নতুন নতুন বন্ধু হলে ভালো লাগে না? গত বছরেই যেমন হলো। সঙ্গে নতুন এক-জনকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল নীলু : 'কে রে? দেখিনি তো আগে?'

'আমার খালাতো ভাই, হোসেন।'

হোসেন ? হাসান-হোসেনের হোসেন ?

নীলুদের একজন মাস্টারমশাই ছিলেন হোসেন সাহেব, তাঁর নাম শুনলেই নীলুর কারবালার কথা মনে পড়ে যায়। এই হোসেনের নাম শুনেও তেমনি হলো তার। বলল : 'হাসান-হোসেন ? হায় হাসান হায় হোসেন, সেই হোসেন ?'

'হায় হাসান হায় হোসেন জানিস না কি তুই ?'

'জানব না কেন ? পড়েছি তো বইয়ে।'

'বইয়ে ? বইয়ে আবার এই সব থাকে না কি ?'

'থাকে না ? তাহলে জানবে কী করে লোকে ?'

'ক্যান্, মহরম দেইখ্যা ?'

'না না, বইতেও থাকতে হয়। বইতে সবই থাকে। মহরমের গল্প পড়েছি আমি। হাসান-হোসেনের নাম শুনলেই মনে পড়ে সেই ফোরাত নদীর কূল, সেই মাটির মধ্যে বসে-যাওয়া ঘোড়ার পা, সেই ছোট্ট ছেলের বুকে-বেঁধা তীর—'

'এয়্যা আবার কী ? তীর-ফির আবার কী ?'

'জানিস না ? কারবালার কথা জানিস না ?'

'নাম জানি কারবালার। ফোরাত-ঠোরাত জানি না।'

'জানিস না ? সে কী রে ? তুইও না, হোসেন ?'

নীলু তখন হারুনকে হোসেনকে বলতে থাকে হাসান-হোসেনের গল্প। আসলে, সেও জেনেছে মাত্র কয়েকদিন আগে। ইস্কুলের বাংলা বইতে সুন্দর একটা লেখা পড়েছিল 'কারবালা-প্রান্তরে'। সুন্দর ? ওই রকম একটা কষ্ট-দেওয়া লেখাকে সে কি না ভাবল সুন্দর ? কিন্তু সত্যি সত্যি, সুন্দরও তো! এত কষ্টের বলেই কি এত সুন্দর লেগেছিল ? কী জানি। গল্পটা তার এত ভালো লেগেছে জেনে মাস্টারমশাই নির্মল-বাবু বলেছিলেন, তাহলে সবটা পড়বে ? সবটা পড়লে আরো ভালো

লাগবে। ইস্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে তখন সে পড়েছিল গোটা বইটা, মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'। নামের মধ্যেই বিষাদ, কষ্টের যে হবে সে তো বোঝাই যায়।

বলতে থাকে নীলু, কেমনভাবে আত্মীয়জন সবাই মিলে কুফায় চলেছিলেন হোসেন। চলতে চলতে এক জায়গায় হোসেনের ঘোড়ার ক্ষুর ডুবে গেল মাটির মধ্যে। গল্পের এইখানটায় পৌঁছলেই কর্ণের কথা মনে পড়ে নীলুর। কর্ণ জানত তার ভবিতব্য, জানত যে যুদ্ধের একেবারে আসল একটা সময়ে তার রথের চাকা গেঁথে যাবে মাটিতে, চলবে না আর রথ, আর সেইটেই তার শেষ মুহূর্ত। হোসেনেরও জানা ছিল, হজরত মহম্মদ তো বলেই দিয়েছিলেন তাঁকে, যেখানে তোমার ঘোড়ার ক্ষুর মাটিতে বসে যাবে, বুঝবে সেটাই হলো কারবালা, সেইখানেই তোমার মৃত্যু।

'কইস কী? আগে থিক্যাই জানত?'

'হ্যাঁ, আগে থেকেই। হোসেনের মনে হলো, এই? এই তবে কারবালা? তাঁর জীবনের শেষ এইখানে? সবাইকে ডেকে তখন বলতে লাগলেন হোসেন, ভাইসব, ভয়ানক একটা বিপদের মুখে এসে গেছি আমরা। এটা হলো কারবালা। সবাই তাকিয়ে দেখে, পাশে গভীর বন আর সামনে ধূ ধূ প্রান্তর। চারদিক থেকে যেন একটা শব্দ উঠছে শুধু: হায়-হায়, হায়-হায়। কাঠ কাটতে গিয়ে বন থেকে ফিরে এল কজন, তাদের কুঠারে রক্তের দাগ।'

'রক্ত? ক্যান্? বনের মইধ্যে মারামারি হইয়্যা গেল?'

'না না, মারামারি না। রক্তটা গাছের। গাছের রক্ত।'

'ধুস্, গাছের আবার রক্ত হয় নাকি?'

'হোসেনের লোকেরাও তো তাই ভেবেই ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল: এ আবার কী, কুঠারের ঘায়ে গাছের থেকে রক্ত ঝরে! দেখে-

শুনে হোসেন বললেন : ভাই রে, ওই আমাদের ভবিষ্যৎ। ভয় পেলে তো আর চলবে না, ওই কাঠই কাটতে হবে।'

'তাপ্পর ? তাপ্পর ?'

'এদিকে তো তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যায় সবার। জলের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। পথ চলছে দিনের পর দিন, এক ফোঁটা দানাপানি নেই কারো মুখে, কোনো বাচ্চারও মুখে--'

'আহা রে!'

একটু দূরে কুলু কুলু বয়ে যায় একটা নদী, নদীর নাম ফোরাত। সেখান থেকে জল আনতে গেল হোসেনের লোকজন। গিয়ে দেখে, সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে এজিদের সৈন্য। এজিদ হলো অন্য দল, বুঝলি তো? অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে সবাই। বলছে, আগে যুদ্ধ করো, যুদ্ধ না করে একবিন্দুও জল পাবে না।'

'ওই যে, দুর্যোধনে য্যামন কইছিল ? বিনা যুদ্ধে নাহি দিব—কী য্যান্ ?'

'সূচ্যগ্র মেদিনী। হ্যাঁ, সেইরকম। কিন্তু শুকিয়ে কি তবে মরে যাবে সবাই ? হোসেনের ছোট্ট ছেলেটাকে বুকে করে নিয়ে আসেন তার মা, এক ফোঁটা জল খাওয়ানোর আশায়। কোলে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন হোসেন। নদীর কূলে এসে সবাইকে ডেকে বলেন : ভাইসব, তোমাদের মধ্যে যদি সাঁচ্চা মুসলমান কেউ থাকো, এই দুধের বাচ্চাটাকে একটু জল খেতে দাও। আমি যদি-বা কোনো দোষ করে থাকি তোমাদের কাছে, এর তো কোনো অপরাধ নেই!'

'দিল তখন, পানি ?'

'নাঃ, দিল না। উলটে বরং হোসেনকে লক্ষ করে ছুঁড়ে মারল একটা তীর। আর, কী হলো জানিস, সেটা এসে বিঁধে গেল একেবারে সেই বাচ্চার বুকে।'

'হায় আল্লা!'

'আগে থেকে তাই তো এত হায়-হায় শব্দ হচ্ছিল সমস্ত কারবালায়! তখন, হোসেনের দলের লোকেরা সবাই বলল, যুদ্ধ করব আমরা। কিন্তু কী নিয়ে করবে যুদ্ধ? সৈন্য নেই সামন্ত নেই, আর এজিদের আছে লক্ষ লক্ষ সৈন্য। তাহলে? পারবে কী ভাবে? কিন্তু না পারুক, যুদ্ধে তবু যাবেই। যুদ্ধে গেল আবদুল ওহাব। বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হলো। তারপর একে একে প্রাণ দিল কাশেম, জয়নাল আবেদিন, আলি আকবর।'

'তারা কেডা?'

'কাশেম হলো হাসানের ছেলে, বাকি দুজন হোসেনের। জানিস তো, যুদ্ধ করতে করতে তেষ্টায় পাগল হয়ে ছুটে এসেছিল একবার আলি আকবর। বলেছিল হোসেনকে: আব্বাজান, একটু জল। দিশেহারা হোসেন তাকে বললেন: জল কোথায় পাব রে বাপ্? জলের জন্যই তো এত কাণ্ড! আমি বরং এই জিবটা বার করে দিই, তা-ই একটু চুষে নে, এতে যদি তেষ্টা মেটে তোর!'

'ইস্ রে!'

'ছেলেরা শহিদ হবার পর এবার এল হোসেনের পালা। চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলল এজিদের দলবল। শেষ পর্যন্ত সিমার নামে একজন ভয়ানক নিষ্ঠুর লোক একটা ছোরা দিয়ে কুপিয়ে খণ্ড খণ্ড করে দিল তাঁর মাথা।'

'হায় হায়!'

'এই সেই কারবালার হায় হায়, হায় হাসান হায় হোসেন। গাছের থেকে রক্তঝরা কারবালার হায় হায়। অদ্ভুত না, গল্পটা?'

হারুন তার মাকে ডেকে বলে: 'আম্মা, আমাগো কথা কী সুন্দর কইতে পারে নীলাই। মহরমের গল্প।'

হারুনের মা বলে : 'না কি? আইচ্ছা? শুনুম হ্যানে একদিন। আইস্‌সো আবার মনু।'

কিন্তু সেই হারুন, সেই হারুন আজ যেন আরেকরকম হয়ে গেছে। প্রতি বছরেই অবশ্য প্রথম-প্রথম এ-রকম হয়, প্রথম দু-একদিন একটু কেমন-কেমন ভাব, একটু জড়োসড়ো। কিন্তু এবার যেন উলটোটাই। সেই জড়েসড়ো ভাবটাই যেন নেই আজ হারুনের।

উঠোনে বসে একটা বাঁশ চিরছিল হারুন আর হোসেন। তার দিকে একটু তাকিয়ে আবার মন দিল কাজে, জিজ্ঞেস করল শুধু : 'আইলি কবে?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নীলু বলে : 'গেলি না কেন একবারও? অষ্টমী গেল কাল, তাও?'

বলল না কিছু হারুন।

একটু রাগ হলো নীলুর। ওদের পাশে এসে বসল, দেখতে লাগল : মনে হয় বেড়া বানাবে। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে একটু পরে বলল : 'গোটা গ্রামটা এবার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, না? কারো বাড়িতেই বেশি কেউ নেই।'

'মোটেই না, আছে। চোখ মেইল্যা ছ্যাহো, ছ্যাখতে পাবা, আছে।' বলে হারুন আর হোসেন একবার নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কী বলল মনে হয়।

হোসেন বলল : 'গফুরগো বাড়ি, জব্বারগো বাড়ি একেবারে ভরভরাট আছে, ছ্যাহো গিয়া।'

'না না, তা তো আছে। বলছিলাম কী, তোরা তো এবার গেলি না আমাদের বাড়ি, জানিস না তাই। সোনাদিরা আসেনি, ঝুম্পুরা আসেনি, রঞ্জুদাই নেই। কতজন যে আসেনি।'

হারুন বলল : 'আসবেও না আর। না আইল তো না আইল, বইয়্যা গেল। এয়্যা তো আর তোগো দ্যাশ না, তোরা তো অ্যাহোন অইন্য দ্যাশের লোক।'

শুনে চমক লাগল নীলুর। কদিন ধরে কেবলই যে-কথাটা শুনে শুনে তার কান পচে যাচ্ছে, সেটাই অমনি করে বলল কি না হারুন? হারুনও? ও, সেইজন্যে? সেইজন্যে এখানে হোসেনের সঙ্গে বসে বসে কী বানাচ্ছে, সেটা তাকে বলছেও না একবার? দুজনে চোখে চোখে বলছে কথা, তাকে লুকিয়ে? বাঃ, বেশ তো! এটা আর আমাদের দেশ না? কী বোকার মতো কথা। তাই কি হয় নাকি কখনো?

'কবে আইলা মনু?' ঘরের দাওয়া মুছতে মুছতে নীলুকে দেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে হারুনের মা।

'ষষ্ঠীর দিন।'

'অ। ভালো আছো তো সব্বাই?'

'হ্যাঁ, ভালো।'

'যামু হ্যানে একদিন। কইয়ো তোমার মায়েড্ডে। আছো তো কয়দিন?'

'না, বেশিদিন না। দশমীর পরের পরেব দিনই এবার যাওয়া।'

'না কি? দশমীর পরেই? ক্যান, এত তাড়া কিয়ের?'

তাড়াটা যে কিসের, নীলুও সেটা বোঝেনি ঠিক। বড়োমামা ইচ্ছে করলেই থাকতে পারত আর কটা দিন। ছুটি তো আছেই। ভেবেচিন্তে নীলু বলল : 'কাজ আছে অনেক। বড়োমামার।' পরে আবার জুড়ে দিল : 'মায়েরও।'

হ্যাঁ, বেড়া-ই। বেড়াই বানাচ্ছিল ওরা। হয়ে যাবার পর হোসেনের কাঁধ জড়িয়ে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করে হারুন, নীলুকে শুধু বলে যায় : 'আইজ যা গিয়া, কাইল যামু হ্যানে তোগো বাড়ি।'

ওদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে নীলু কিছুক্ষণ বসেই রইল ওইখানে। এই সেই হারুন? মনে মনে ভাবল সে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল তার। সেই হারুন? এইরকম হয়ে যায় লোকে? আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

একটু যেন তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে আসে এখন। মনমরা একটা বিকেলের দিকে ঢলে পড়েছে বেলা। হোসেনকে পেয়ে গিয়ে এখন আর আমার কথা মনেই নেই তোমার, না? বেশ, তাতে আর কী হয়েছে? এ-রকম তো হতেই পারে। সব সময়ে যে সবাইকে সবার ভালো লাগে, তা তো আর হয় না। হয়? কয়েকটা পাখি উড়ে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। বাসায় ফিরছে ওরা। না, দু-একটা আবার বসছেও গিয়ে গাছে। আমার কি কষ্ট হচ্ছে? যাঃ, কষ্ট হবার কী আছে? লজ্জা হচ্ছে? তা একটু হচ্ছে বোধহয়। তাই-বা কেন? লজ্জারই-বা কী? বেশ হয়েছে। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করে যদি ভালো থাকে, তাতেও তো আমার ভালো লাগারই কথা, তাই না?

সুখের দুটো পায়রা! হাঁটছে নীলু, হাঁটতে হাঁটতে ওই শব্দকটা মনে এল। বেশ-একটা দোলা আছে যেন।

আচ্ছা!

সুখের দুটো পায়রা এসে বসছে জুড়ে একটি ডাল।

আরে! এটা কি একটা কবিতা না কি? এইরকম করে লেখে না কি কবিতা? এইরকম করে লেখে ফুলমামি? এই রকম করে লেখে দাদা?

হাঁটতে হাঁটতে নীলু অনেকরকম করে শব্দগুলো আওড়াতে থাকে, অনেকবার, মনে মনে। আরো কয়েকটা শব্দ। আরো। শব্দে শব্দে মিলও হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে বাড়িতে এসে পৌঁছল নীলু। পেট্রোম্যাক্স জ্বালবার জন্য জস্তিমামা এসে হাঁক দিয়েছে ততক্ষণে: 'কই বৌঠান, চা-ঠা হইবে না কি? না কি দিবানিদ্রাই চলতে আছে এখনো?'

৯

মাথার ওপরে একটা আর দুহাতে দুটো ধুনুচি নিয়ে ফটিককাকুর আরতি-নাচ শেষ হয়ে গেল। ওইরকম তিন-তিনটে আগুনজ্বালা ধুনুচি নিয়ে কেমন করে এঁকেবেঁকে নাচে ফটিককাকু, গন্ধভরা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যায় সব, চোখ অবশ্য জ্বালা করে একটু। নীলুর কেবলই ভয় হতে থাকে, এই বুঝি পড়ে গেল সব হুড়মুড় করে। পড়ে না কিন্তু, কখনোই। এমন কী, নাচের তালে ধুনুচিটাকে ফটিককাকু একেবারে উলটে নিয়েও পাক দিয়ে আসে, টুকরো একটা আগুনকণাও তার থেকে পড়ে যায় না তবু।

শেষ হয়ে গেছে আরতিনাচ, থেমে গেছে ঢাক-কাঁসর। মণ্ডপের বারান্দায় উঁচু করে ঝোলানো পেট্রোম্যাক্সটা নামানো হয়নি তখনো। ধবধবে আলোয় ঠাকুর দেখার জন্য এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে লোকজনের যাওয়া-আসা চলছে। দিনের বেলায় আসে অন্য গ্রামের লোক, খাল পেরিয়ে। সন্ধেবেলা এ-গ্রামের। বারান্দার ওপরে কয়েকটা চেয়ার পাশা-পাশি সাজানো, দাদুর বন্ধুরা কেউ যদি আসে। এখন অবশ্য নেই কেউ আর। একাই বসে বসে গড়গড়া টানছে দাদু, আর তাকিয়ে দেখছে লোকের আসা-যাওয়া।

ভিতরের ঘরে বসে মা বলল বড়োমামাকে : 'এখন তো বলাই দরকার। কবে আর বলবে? সময় তো বয়ে যায়।'

'যায় তো, কিন্তু কীভাবে-বা বলি।'

বড়োমামি বলে : 'সেটাই হলো কথা। সাহস তো নেই এক কড়ার।'

'সাহসের কী। সাহসের কথা না। এ তুমি বুঝবে না। এটা বলার মধ্যে একটা লজ্জার কথা আছে না? একটা কষ্টের কথা আছে।'

একটু রাগ করে বড়োমামি বলে : 'বুঝব না কেন? বুঝি সবই। কিন্তু বলতেও তো হবে। বলতেই যেটা হবে, সেটা বলে ফেলাই ভালো।'

একটু পরে নীলু বারান্দায় গিয়ে বলল : 'দাদু, ঘরে চলো।'

'কেন, ঘরে কেন?'

'বড়োমামা কী যেন বলবে তোমাকে।'

'না কি? তা বড়োমামা এলেই পারে।'

'না, শুধু বড়োমামা না, সব্বাই। সব্বাই বলবে : মা, বড়োমামি, সেজোমামা, সব্বাই।'

'ও বাবা, সব্বাই? কী বলবে সব্বাই?'

'সে তো জানি না। ঘরে চলো তুমি।'

আরো খানিকক্ষণ ভুড়ুক ভুড়ুক করে, গড়গড়াটা দাদু নামিয়ে রাখল নিচে। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে এসে পা তুলে বসল একটা খাটের ওপর। মুখোমুখি আরেকটা খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে বড়োমামা আর সেজোমামা। খাটের পাশে মেঝের ওপর মা। সামনে একটা লণ্ঠন। তার আলো যেখানে অন্ধকারের মধ্যে মিশে যাচ্ছে প্রায়, সেইখানে, দুই ঘরের মাঝখানে চৌকাঠের পাশে আবছা হয়ে আছে বড়োমামি আর দিদিমা।

খানিকক্ষণ সব চুপ। দাদুই কথা বলল প্রথম। বলল : 'কী কথা? একেবারে সভা করে কথা?'

বড়োমামা গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করল : 'না, তেমন কিছু না। কথা, এই, ভবিষ্যতের। কী হবে, কী করা হবে, এইসব। এখন তো—এখন তো ভাবার সময় হয়েইছে—'

'কী, কারো বিয়ের কথা ?'

মা আর বড়োমামা একবার চোখে চোখে তাকাল। আবার শুরু করল বড়োমামা : 'না, বিয়ের কথা না, এই থাকাটাকার ব্যবস্থার কথা।'

'থাকাটাকার ব্যবস্থা ? মানে ?'

তারপর বড়োমামা প্রায় যেন একটা ইতিহাসের বইয়ে পড়া গল্পের মতো বলে যেতে লাগল আমাদের এই দেশ ভেঙে যাবার কথা। বড়োরা তো একদিন কেউ প্রায় বিশ্বাসই করেনি যে এসব হতে পারে কখনো, পাকিস্তান নামে নতুন একটা দেশ জন্মাতে পারে, কিন্তু হলো তো তবু! হিন্দুরা যেখানে বেশি, সেটা না কি একটা দেশ ; মুসলমানেরা বেশি হলে সে হলো আরেক দেশ! যা ভাবাও যেত না, সে-রকম একটা আজব কাণ্ড তো হয়েই গেছে এখন, এ তো আর কল্পনা নয়, রাগের কথা নয়, এ তো একেবারে বাস্তব। এই যেখানে আমরা বসে আছি, এটা তো এখন পাকিস্তান। তো এই পাকিস্তানে কি থাকা যাবে আর ? থাকা উচিত ?

'কেন ? অনুচিতটা কী ? অসুবিধে কোথায় ?'

'বাঃ, নেই অসুবিধে ? কত জায়গায় কত দাঙ্গা, জোরজুলুম, যা-খুশি, তাই। কেবলই অন্যের মর্জির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা—'

'তেমন কিছু কি হয়েছে এখানে ? এই গ্রামে ?'

'হয়নি হয়তো এখনো। কিন্তু হতে কতক্ষণ ? যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো সময়ে কিছু-একটা ঘটলেই হলো।'

চুপ করে রইল সবাই খানিকক্ষণ। তারপর বড়োমামা বলতে শুরু করে আবার : 'সেইজন্যে আমরা ভাবছিলাম, কলকাতার দিকে কোনো-একটা আস্তানা তো খুঁজতেই হবে আমাদের, আপনারাও যদি সেখানে —মানে, মা আর আপনি একা এখানে পড়ে থাকবেন—আসলে, এ তো বুঝতেই হবে যে এটা আর আমাদের দেশ নেই—'

'অদ্ভুত কথা। নিজের দেশটা কি রাতারাতি অন্যের দেশ হয়ে যায় না কি? হতে পারে কখনো?'

'হবার কথা তো না, কিন্তু, মুশকিল যে, কখনো কখনো এমন একটা সময় তো আসে, যখন—'

'যখন অনেক ঝঞ্ঝাট হয়, মুশকিল হয়, কষ্ট হয়। সে তো হয়ই। তাই বলে কি নিজের দেশটাই অন্যের দেশ হয়ে যায়? সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হয়? না, আমাদের এখান থেকে যাওয়া হবে না কোথাও।'

মা একটু নিচু গলায় বলতে শুরু করল: 'এখানে তো কেউই আর নেই প্রায়, সবাই তো না কি চলে গেছে শুনি।'

'যাক। যাক সব জাহান্নামে।'

বড়োমামা বলে: 'একা-একা থাকেন, আমরাও তো আসতে পারি না সব সময়ে—'

'সে তো সব সময়েই থাকি। এর মধ্যে আর নতুন কী?'

'না, মানে, এখন তো আরো—'

'আরো কম আসবি। হয়তো আসবিই না। না-হয় আসবি না, কী আর করব। এবারই তো আনলি না ছেলেপুলেগুলিকে। ভানুও চলে যাবে হয়তো, ফুলবৌও যাবে কোথাও। থাকব আমরা দুজন শুধু, থাকবে ওই বোকাসোকা কুঞ্জটা, আর এই শুনশান্ বাড়ি। তা, কী আর করব। থাকতে হবে সেইভাবেই।'

মেঝের ওপর উপুড় হয়ে গালে হাত দিয়ে নীলু সব শুনছিল। বাজারে যাবার পথে সবার সঙ্গে দাদুর কথা শুনে নীলু আগেই জানত যে দাদু কখনো বাড়ি ছেড়ে যাবে না। মনে মনে তাতে খুশিই ছিল নীলু। দাদুরা যদি না থাকে, তাহলে বাড়ি কথাটার আর মানে রইল কী। যদি সেজো-মামা না থাকে, যদি ফুলমামি না থাকে? 'ভানুও চলে যাবে' বলল কেন দাদু? সেজোমামা বলেছে কিছু, যাবার কথা?

বড়োমামা উঠে পায়চারি শুরু করল ঘরে। লণ্ঠনের সল্‌তেটা একবার বাড়িয়ে একবার কমিয়ে খেলা শুরু করল নীলু। 'কী হচ্ছে ওটা' বলে একটা ধমক দিল মা। 'কিছু তো একটা করতে হবে' ফিস্‌ফিস্‌ করে দূর থেকে বড়োমামি বলল, প্রশ্রয়ের সুরে।

তখন, গলাটা একেবারে নরম করে নিয়ে, যেন খানিকটা অন্যমনস্কের মতো বলতে থাকে দাদু : 'বলিস্‌-যে তোরা, খুকি, ভাব্‌ একবার, ওই কাছারি ঘরটার পিছনে সুপুরিগাছের সারি, একটা একটা করে ওর সবকটা আমার নিজের হাতে লাগানো, সেই কোন্‌ আদ্যিকালে, তোদের তখন জন্মও হয়নি। একটু একটু করে ওরা বড়ো হলো আমার চোখের সামনে। খালের ধার থেকে দালানের সিঁড়ি পর্যন্ত গোটা পথটার প্রত্যেকটা ঘাস খুঁটে খুঁটে পরিষ্কার করি রোজ ভোরবেলা, দেখিস তো সব। ওই আম কাঁঠাল তেঁতুলের গাছগুলি, দিনান্তে একবার ওদের গায়ে হাত না রাখলে ভালোও লাগে না আমার। আর ওই-যে মণ্ডপের পাশ দিয়ে পুকুরের পিছন দিকটা—তোরা তো ওদিকে যাস্‌ও না বেশি—ওইখানে পড়ে আছে বাবার মঠ, ঠাকুরদার মঠ, এখনো তোর মা ওখানে নিত্যি গিয়ে পিদিম জ্বালিয়ে আসে। এইসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, বল্‌ তো আমি যাই কোথায়, যাই কেমন করে—'

বাই খুব চুপ। মা-র বকুনি শুনেও নীলু কেবলই বাড়াচ্ছে-কমাচ্ছে আলো। সেজোমামা উঠে গিয়ে নিভিয়ে দিয়ে এল মণ্ডপের পেট্রোম্যাক্স। লোকজনের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। ঘরের মধ্যে চুপ। বড়োমামা পায়চারি করেই চলেছে। চৌকাঠের ধার থেকে দিদিমা বলে উঠল : 'দশটা বুঝি বাজল। খাওয়া-দাওয়া নাই আজ? ওঠো, ওঠো সব—'

শেষ হয়ে গেছে দশমীর বরণ। প্রদীপ জ্বালিয়ে, থালায় ভরা পান সিঁদুর মিষ্টি নিয়ে এসেছিল সবাই মণ্ডপে, মা দিদিমা বড়োমামির সঙ্গে ফুল-মামিও। ঘোমটা-দেওয়া ফুলমামির চিবুকটা ধরে মা বলে: 'আহা, দেখো তো, কেমন একেবারে ভগবতীর মতো মুখখানা! তো এ-রকম হয়ে থাকো কেন সারাদিন? আর কিছু না করো, একটু সাজলে-গুজলেও তো পারো।'

ফুলমামি বলে না কিছু। শুধু, সবাই যা করে, সবার পিছনে পিছনে সেইরকম করে যায় শুকনো মুখে। উঁচু একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দুর্গার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয় দিদিমা, দুহাতে বড়ো দুটো পানপাতা নিয়ে মুছিয়ে দেয় তার দুই গাল। হাতের তালুতে প্রদীপশিখার আভা লাগিয়ে নিয়ে, ঘুরিয়ে আনে তার মুখের সামনে থেকে। তারপর একটা নারকেল-নাড়ুর টুকরো ভেঙে লাগিয়ে দেয় ঠোঁটে। হাত জোড় করে বলে দিদিমা: 'এসো মা আবার। আবার এসো।'

এইরকমই করে সবাই, সব ঠাকুরের কাছে গিয়ে। আর তা সাঙ্গ হয়ে গেলে নিজেদের মধ্যে এ ওর কপালে টেনে দেয় সিঁদুর, যে যার বড়োকে প্রণাম করে পায়ে হাত দিয়ে, এ ওর মুখে তুলে দেয় একটুকরো মিষ্টি। মণ্ডপ ছেড়ে আসবার সময়ে দিদিমা একবার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দুর্গাপ্রতিমার মুখখানার দিকে, আর বলে, প্রতিবারই বলে: 'ছাখ্

দ্যাখ্, ভগবতীর চোখে কেমন জল!'

নীলুরও মনে হয়, সত্যিই তো। চোখের কোণের ঢালু বেয়ে কেমন একটা চকচকে ভাব আছে না? ওটা কি ছিল কাল? পরশু? দেখিনি তো তখন। জলই তো। বাপের বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে তো, হ্যাঁ, ওই তো ভগবতীর চোখে জল!

বরণ শেষ হয়ে গেছে। দুপুরের এখন বিকেল-বিকেল ভাব। রোদ্দুরটা নরম। ঠিক সেই সময়ে, ফুলমামি এসে ধরল নীলুকে খিড়কি-পুকুরের কাছে। কেমন-একটা ঘোলাটে চোখ করে বলল : 'এই-যে, এই-যে খোকনমণি, কথা দিয়েছিলে, মনে নেই?'

'কথা? কিসের কথা?'

'ছিল না কথা? ওই বাড়িটায় নিয়ে যাবার কথা?'

'ও, ঠিক তো। যাবে এখন?'

'যাবই তো। যাব বলেই তো এলাম। চল্ শিগগির—'

যেন কিছু চুরি করতে চলেছে দুজনে, এম্নি করে পা টিপে টিপে, ইটে-বাঁধানো পথটা এড়িয়ে, সুপুরিগাছের সারির ভিতর দিয়ে দিয়ে, মস্ত ওই ইটের স্তূপটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। জংলা লতায় ভরে আছে পথ, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায় কেবলই। ভাঙা ওই বাড়িটার যেখানে গিয়ে বসল ওরা, অনেকদিন আগে সেটা এর বারান্দাই ছিল নিশ্চয়।

দাদুর কাছে শুনেছে নীলু, বাড়িটাকে বলে ছ-আনি বাড়ি। আগে ওরা ভাবত ছোঁয়ানি বাড়ি, বলতও তা-ই। সেটা তাদের বেঠিক বলে মনে হতো না একেবারেই। জঙ্গলের মধ্যে এক কোনায় কোন্ যুগের এক হাড়পাঁজর বার-করা পোড়ো বাড়িকে ছোঁয়ানি বলাই ঠিক না? একটা ভূত-ছম্‌ছম্ ভাব আছে শব্দটায়। দাদু শুনে হেসেছিল। বলেছিল : 'আরে না, ছোঁয়ানি না, ছ-আনি। এই গ্রামের জমিদার ছিল যারা, তাদের শরিকদের মধ্যে এক সময়ে ভাগাভাগি হয়ে যায় সব। একভাগে

পড়ে দশ-আনার অংশ, অন্য ভাগে ছ-আনার। সেই ছ-আনার সম্পত্তি পেয়েছিল যারা, এই বাড়ি ছিল তাদের। বুঝলি তো? সে কী জাঁক-জমক ছিল একসময়ে! এখন তো এই হাল! সে অনেকদিনের কথা।'

'মায়ের ছোটোবেলায়?'

'মায়ের? তোর মায়ের তখন জন্মই হয়নি মোটে। সেসব দেখেছি আমাদের ছোটোবেলায়। ভাঙতে শুরু করেছে তখনই, সেই সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে।'

ফুলমামি ঘুরে বেড়ায় দেয়ালঘেরা জঞ্জালের মধ্যে। কোনো ঘরেরই ছাদ নেই আর। এক কোণে একটা সিঁড়ির আদল দেখা যায়, খানিক দূর ওঠাও যায়, কিন্তু তার পরেই ফাঁকা। দেয়ালের বুক ভেঙে ভেঙে নানা-রকম আগাছা বেরিয়ে আছে। শ্যাওলাজমা গন্ধ। ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় এসে বসল ফুলমামি, সেখানে আগাছা নয়, দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে গোটা একটা অশ্বত্থের ডাল।

হঠাৎ বলে ওঠে ফুলমামি: 'সবার হবে। সব্বার।'

'কী হবে? কী বলছ তুমি?'

'এইরকম হবে, এই বাড়িটার মতো দশা। মজা হবে তখন!'

নীলু চুপ করে তাকিয়ে রইল অশথডালটার দিকে। একটু পরে ফুলমামি বলল আবার: 'সামনের দিকে ঝাড়জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওই খালের কিনারটা দেখতে পাচ্ছিস? আর ডাইনে দেখ্, ও-ই কোনা দিয়ে দেখা যায় আকাশের ফালি। দেখছিস? ঠিক ওইখান থেকেই সূর্য ওঠে। প্রথমেই নিশ্চয় অশথগাছটার ডালে তার আলো এসে পড়ে।'

'জানলে কেমন করে?'

'জানি। জানতে হয় আমাকে। আমি তো আমি না, আমি জানি। এইখানে এসে একদিন ঘুমিয়ে থাকব, দেখিস। মুখের উপর সূর্য উঠবে।'

ওই বিকেলবেলায় ফুলমামির চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন

কেঁপে ওঠে নীলুর গা। অস্বস্তিটা কাটাবার জন্য বলে ওঠে সে : 'একটা জিনিস পড়বে? বলতে পারবে না কিন্তু কাউকে।'

'কী জিনিস?'

'খুব গোপন।'

'গোপন? কী এমন গোপন?'

নীলু তার পকেট থেকে কাগজ বার করে একটুকরো। হারুনদের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে যে-কথাগুলি গুন্‌গুন্ করছিল কাল, সেটা সে লিখে নিয়েছে একটা কাগজে।

কাগজটা দেখে ভারি সুন্দর একটু হেসে ফুলমামি বলল : 'কবিতা? কবিতা লিখেছিস তুই?'

'যাঃ, কবিতা না। এম্‌নি কয়েকটা কথা। মনে হলো, তাই—'

'বলিনি তোকে যে তাকেই বলে কবিতা? দাঁড়া, পড়ি তো আগে—'

'না, আমি পড়ব।'

কাঁপা-কাঁপা ভাঙা ভাঙা গলায় নীলু তখন পড়তে শুরু করল :

সুখের দুটি পায়রা এসে বসছে জুড়ে একটি ডাল
আমার সেথা কীই-বা অধিকার!
জাগাই কেন বৃথাই সেথা মৃত আশার ব্যর্থ তাল
মনোমাঝেই থাক্ সে হাহাকার।

এ পর্যন্ত শুনেই ফুলমামি বলে উঠল : 'বাঃ, তুই লিখেছিস? বেশ তো হয়েছে।'

'দূর, তুমি এম্‌নি-এম্‌নি বলছ!'

'না মোটেই, এম্‌নি-এম্‌নি নয়। খুব ভালো। কিন্তু ও-রকম সেথাটেথা লিখেছিস কেন? ওসব কি বলিস তুই?'

'লেখে তো কবিতায়!'

'তবে যে বললি তুই কবিতা লিখিসনি?'

দুজনে হেসে উঠল একসঙ্গে। একটু পরে ফুলমামি বলল আবার : 'কবিতায় যা লেখে লিখুকগে। তুই যেমন ভাবিস, যেমন বলিস, তেমনি লিখবি। সেথাটা মোটে ভালো কথা না। আবার একখানা নয়, দুদুটো সেথা লাগিয়েছেন বাবু!'

গভীর মন দিয়ে গালে হাত রেখে ভাবতে বসল নীলু। তারপর বলল : 'আচ্ছা বেশ, যদি লিখি—আমার তাতে কীই-বা অধিকার—হয় না?'

'হবে না কেন? বেশ হয়। আর পরেরটা? পরেরটার কী করবি?'

আরো খানিকক্ষণ ভেবে নীলু বলল : 'যাকগে, পরেরটা পরে ভাবব। শোনো তো আগে সবটা—'

একটু যেন সাহস বেড়ে গেছে নীলুর। যেন কবিতাই পড়ছে, এমন-ভাবে সবটা সে পড়ে শোনাতে লাগল।

কবিতাপড়া শেষ হয়ে গেলে নীলু ভাবছিল ফুলমামি আরো কিছু বলবে হয়তো-বা। শুনতে ইচ্ছে করছিল তার আরো কথা। কিন্তু খুব চুপ করে রইল ফুলমামি। খানিক পরে, নিচু গলায় মিষ্টি একটা সুর ছড়িয়ে গাইতে লাগল নীলুর অচেনা একটা গান : 'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই।' শুনে, একটু আগে আজ মণ্ডপে দেখা লক্ষ্মীর মুখটা মনে পড়তে লাগল নীলুর। গাইতে গাইতে একটা লাইন এল 'হলো না ভার ফুটে ওঠা, কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা', আর ওই লাইনটার সঙ্গে সঙ্গেই গানটা কেমন থেমে গেল হঠাৎ, শেষ হবার আগেই। নীলু মুখ তুলে দেখে, পাঁজর-বার-করা দেয়ালে মাথা রেখে চোখ বুজে বসে আছে ফুলমামি, চোখের কোণ বেয়ে টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে জল। বিকেলের আলো তখন অল্পে অল্পে গড়িয়ে যাচ্ছিল অস্তসূর্যের দিকে।

ফিরে এসে বাড়িতে ঢোকার মুখে সেজোমামার সঙ্গে দেখা। 'আরে, এই তো। এই তো তোরা! কোথায় গিয়েছিলি? ঢোকো ঘরে, দেখবে মজা' বলেই ঘোমটা-টানা ফুলমামির পাশ কাটিয়ে চলে গেল সেজোমামা। চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থেকে নিজের বুকে দুমদুম্ কয়েকটা কিল মারল ফুলমামি। তার একটু-আগেকার সেই মুখখানা যেন পালটে গেছে আবার। এখন যেন অন্য মানুষ, নীলুকে ছেড়ে সিঁড়িগুলোর ওপর দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ঘরে ঢুকল ফুলমামি।

পিছনে পিছনে যেতে যেতে নীলু শুনতে পেল মায়ের গলা: 'এই তো, এসে গেছে। ছিলে কোথায়, এতক্ষণ?'

তারপরে দিদিমা: 'কই? এসেছে? বলি, গিয়েছিলে কোথায়, এই ভরসন্ধ্যেবেলা? কোনো হায়া নেই তোমার? আমাদেরও কি পাগল করে তুলবে?'

ভিতরে কোনো সাড়া নেই। নীলু আর ভরসা করে ঢুকল না সে-ঘরে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল শুধু মা আর দিদিমার কথা।

মা বলছিল: 'থাক এখন ওসব। এসে তো গেছে। যাও তোমার ঘরে যাও প্রমীলা।'

'তুই তো বলবি—থাক ওসব। কিন্তু তা করলে তো আমার চলে না। বচ্ছর ভরে এই এক ঝঞ্ঝাট তো সয় না আমার। ছিঃ! ছী-ছি! বাইরের লোকের কথা শুনতে শুনতে প্রাণান্ত, কত আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় বল্। পাগলামি করবে তো ঘরে বসে করলেই পারে। পাড়া মাতিয়ে বেড়ানো কোন্ দুঃখে? জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারল একেবারে!'

'থাক্ মা, থামো। যাও প্রমীলা, ঘরে যাও।'

নিজের ঘরে গেল না ফুলমামি। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ওইখানে,

দেয়ালে ঠেস দিয়ে। নীলু বসে রইল পিছনের সিঁড়ির ওপর। কী অন্যায় হয়েছে, সেটা সে বুঝল না ঠিক।

সামনের বারান্দায় বসে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছে দাদু। কুঞ্জ এসে খবর দিচ্ছে : 'জোয়ার আইবে রাত্তির তিনডায়। তাইলে ঠাকুর নামাইতে হইবে কয়ডায় ? আড়াইডায় না ছুইডায় ?'

'তোর সেটা ভাবতে হবে না। তুই এখন তোর নিজের কাজে যা।' বলে আবার ভুড়ুক ভুড়ুক শুরু করে দাদু।

১১

অনেক লোকের কল্‌বলানিতে ভেঙে গেল সকালবেলার ঘুম। চোখ না খুলেই ভাবতে লাগল নীলু, এত ভোরে এত কথা আসে কোথা থেকে। পরে মনে হলো, না, ভোর তো নয়, এখন নিশ্চয় অনেক বেলা হয়ে গেছে। চোখ খুলে দেখল, ঠিক তাই, রোদ্দুর এসে পড়েছে ঘরেরও মধ্যে। বিসর্জনের ধুমধামের পর, মণ্ডপে বসে শান্তিজল নেবার পর, দালানে এসে পাঁচরকমের নারকোলের মিষ্টিভরা থালা থেকে সবকটা খেয়ে নেবার পর, একেবারে শেষরাতে তো ঘুমিয়েছে কাল! ঘুম ভাঙতে তাই বেলা তো একটু হবেই।

কিন্তু এত কথা কেন চারদিকে? ও, আজ না বিজয়ার দেখাশোনা? আজ না বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রণাম করার আর নাড়ু খাওয়ার ঘটা? বেরিয়ে পড়েছে নিশ্চয় সবাই, এসে গেছে আমাদের বাড়িতেও অনেকে, কল্‌বলানি তো হবেই!

আড় ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসল নীলু। কান পেতে শুনতে চাইল দু-একটা কথার ধাঁচ। ঠিকমতো ধরতে পারল না কিছু। বিজয়ার দেখা করতে এসে কি ও-রকম ছোটাছুটি করে কেউ? ও আবার কী? জানলা দিয়ে দুজনের দৌড় দেখা গেল। মাঝে মাঝে দু-একটা চিৎকার-শব্দ: চিলাকোঠায় নাই? ঘরামিরে ডাক্। জাল আছে নাকি, জাল?

চিলেকোঠা, ঘরামি, জাল—কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক? তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামল নীলু। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, ভিতরের

উঠোনে বাইরের উঠোনে সব জায়গাতেই লোকের পরে লোক, কিছু চেনা কিছু-বা অচেনা। কারো মুখ শান্ত নয়, কারো মুখে কোনো বিজয়া নেই। পুবের ঘরে গিয়ে দেখে, দিদিমা শুয়ে আছে উঁচু খাটের ওপর, মা আর বড়োমামি হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে নিচে।

দিদিমার কি তবে শরীর খারাপ হলো হঠাৎ?

কাছে বসে নীলু ঝাঁকুনি দেয় মাকে। জিজ্ঞেস করে: 'কী হয়েছে মা? দিদিমার কিছু হয়েছে?'

মুখ তুলে তাকাল মা। চোখদুটো লাল।

'অসুখ হলে তো ডাক্তার আসবে, ওষুধ দেবে। ও-রকম করছ কেন তোমরা?'

মা বলে: 'দিদিমার হয়নি কিছু।'

'হয়নি তো এ-রকম করছ কেন?'

মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে: 'তোর ফুলমামি তোকে কিছু বলেছিল কাল?'

অবাক হয়ে বলে নীলু: 'বলেছিল মানে? কী বলবে? কত কিছুই তো বলেছে।' একটু চুপ করে থেকে নীলু বলে ওঠে: 'কেন, ফুলমামির কথা কেন? কিছু কি হয়েছে ফুলমামির? কী হয়েছে মা?'

'পাওয়া যাচ্ছে না তাকে, ভোর থেকে। কোথাও যাবার কথা কি বলেছিল তোকে?'

'পাওয়া যাচ্ছে না?' মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে নীলুর। পাওয়া যাচ্ছে না ফুলমামিকে, তার মানে কী? এক ঝটকায় উঠে সে দৌড় লাগায় চিলেকোঠার দিকে—ও, এইজন্যে চিলেকোঠার কথা—না, চিলে-কোঠায় গিয়ে তো তবে লাভ নেই, সে তো নিশ্চয় খুঁজেইছে ওরা—দিকবদল করে সে ছুটে গেল বাইরের দিকে। কেউ জানে না, কিন্তু সে নিশ্চয় জানে কোথায় আছে ফুলমামি। ছ-আনি বাড়ির কোনায় ইটের

পাঁজর ভেঙে যে অশথগাছের ডালটা, তার নিচে বসে ভোরের আলো দেখতে দেখতে নিশ্চয় ওখানে ঘুমিয়ে পড়েছে ফুলমামি!

সেদিকে দৌড়োচ্ছে, পথে তাকে দেখতে পেয়ে হারুন জিজ্ঞেস করে: 'দৌড়াইস ক্যান্?'

দৌড়োতে দৌড়োতেই নীলু বলে: 'ফুলমামিকে খুঁজে পাচ্ছে না ঘরে—ওইখানে—নিশ্চয় ওইখানে আছে—ওইখানে—

'কইস কী?' বলে হারুনও দৌড়োয় তার পিছন-পিছন।

নেই অবশ্য সেখানেও। আনাচে-কানাচে, জংলা জমির মধ্য দিয়ে ওইদিককার খাল পর্যন্ত সবটাই দেখে এল ওরা, ফিরে এল আবার বাড়ির মুখে। 'এতক্ষণে হয়তো পৌঁছেই গেছে ঘরে, না রে?' একবুক ভয় লুকিয়ে হারুনকে প্রশ্ন করে নীলু। হারুন বলে: 'মনে তো লয়।'

বাড়ির হট্টগোল ফুরোয়নি তখনো। জন্তিমামা আর সেজোমামা কোথা থেকে ঘুরে এসে বলল: 'নদীর ঘাটে সব মাঝিকেই জিজ্ঞেস করে তো দেখলাম, কেউ কোনো খবর দিতে পারে না। কোনো নৌকোই ছাড়েনি না কি কাল সন্ধ্যের পর।' বেনেবাড়ির নন্দদাদু বলে: 'জাউলারা আইছে? জাল দিতে কও, পুকুরে জাল দিতে কও, দেরি কইরো না আর।' নিতাই দত্ত ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে জনে জনে: 'কিছু কি হইছিল না কি? মন্দ কথা কইছিল কেউ? জিগাও দেহি ভিতরে।' ফুলমামাকে কোথাও টেলিগ্রাম করতে হবে কি না, জানতে চায় মাধবমামা। থমথমে মুখে দাদু শুধু বলে: 'এখন না।'

দালানের সিঁড়ির নিচে বসে বসে বিলাপ করছে আবদুল: 'এইডা কী হইল? আমরা আর মুখ ছাখামু ক্যামনে? হ্যাযে কি না আমাগো গ্রাম থিক্যা—'

দাদু আবার বলে: 'চুপ কর্। কথা বলিস না বেশি।'

আচ্ছা, নিশির ডাক—নিশির ডাক কি হতে পারে? নীলুর মনে পড়ে, এইরকমই একবার তো ভোর থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না সঞ্জুকেও। মেজোমামি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। পুকুরধারে খালপাড়ে ছোটাছুটি করবার পর একজন এসে খবর দিয়েছিল, পাওয়া গেছে তাকে বেনেবাড়ির পিছনে একটা আস্তাকুঁড়ের কাছে, দিব্যি ঠাণ্ডা হয়ে সঞ্জু না কি ঘুমিয়ে ছিল সেখানে। ডেকে তুলতেই একটু অবাক সঞ্জু আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসে বাড়িতে, যেন কিছুই হয়নি। সবাই জিজ্ঞেস করে: 'কী করছিলি তুই ওখানে? কেন গেলি ওখানে?' সঞ্জু শুধু বলে: 'জানি না তো!' তারপর আবার বলে: 'কে আমাকে ডাকল-যে? তার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম।' 'সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলি? কে ডাকল?' 'জানি না তো।' দিদিমা শুধু ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বলেছিল: 'সরো সবাই, এত জেরা করার কিছু নেই। ভালোয় ভালোয় ফিরেছে যে, এই-ই খুব। বোঝো না কে ডাকল? এ তো নিশির ডাক।'

'নিশির ডাক' কথাটায় সেই থেকে একটা রহস্যভরা ভয় জড়িয়ে আছে। ফুলমামিকেও তবে নিশিই কি ডাকল? আচ্ছা, কথাটার মানে কী? নিশি নিজেই কি ডাকে? না কি নিশিতে ডাকে অন্য কেউ? কে ডাকে?

হারুনকে সে-কথা বলল নীলু। বলল: 'যাবি একবার? বেনেবাড়ির পিছনে?'

'দূর, ফি-বারেই কি ওই একজায়গায় ডাকবে না কি নিশি?'

'তবু—'

'আইচ্ছা, চল্ তবে যাই।'

আরো একবার ওরা পাক দিয়ে এল বেনেবাড়ির পিছনটায়। নাঃ, কোনো চিহ্ন নেই সেখানে। ফিরে যখন এসেছে আবার, পুকুরধারটা

তখন ভরে গেছে লোকের ভিড়ে। জাল ফেলা হয়েছে পুকুর জুড়ে। তার মানে কি সবাই ধরেই নিয়েছে যে ওই জলে ডুবে গেছে ফুলমামি? ডুবে গেলে, এতক্ষণ ডুবে থাকলে কি বেঁচে থাকে কেউ? কী ভাবছে ওরা? কেন জাল দিচ্ছে? মনে পড়ল, এই তো সেই পুকুর, ক-বছর আগে যেখানে ডুবে যাচ্ছিল সে, আর চুলের মুঠো ধরে তাকে তুলে এনেছিল হারুন। ইস্, ওইরকম কেউ তুলে আনতে পারে না ফুলমামিকে?

'কী, কী, পাওয়া গেল না কি?' জেলেদের মুখচোখ দেখে চেঁচিয়ে ওঠে অনেকে, মনে হচ্ছে যেন জালে ধরা পড়েছে কিছু।

'কী, পাওয়া গেল?'

'মনে তো লয়।'

শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই। জালে হাত লাগায় আরো কেউ কেউ। বেশ ভার-ভার লাগছে জালটা, ঠিক। পাওয়ার উত্তেজনার সঙ্গে তখন মিশে গেছে একেবারে-হারানোর হতাশ্বাস। তার মানেই তো, বেঁচে নেই! অবশ হয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে বড়োমামা সেজোমামা জন্টিমামা। দাদু বসে আছে দূরের ওই বারান্দাতেই। জাল উঠছে। উঠে আসছে জাল। হ্যাঁ, এইবার যেন তার মধ্যে দেখাও যায় কিছু। ওই-যে, ওই-যে, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, কী ওটা? কী দেখা যায়?

না, ওটা ফুলমামি না। না-পাবার হতাশার সঙ্গে এবার যেন মিলে গেল বেঁচে থাকবার ক্ষীণ একটা আশ্বাস। যেন সাময়িক একটা মুক্তিই পেল সবাই। না, ফুলমামি নয় ওটা। জালের মধ্যে উঠে এসেছে আগের দিনের বিসর্জনের চিহ্ন একটা, সরস্বতীর খড়-কাঠামো। সরস্বতী? না কি লক্ষ্মী ওটা? সেটা এখন আর বোঝা যায় না ঠিক। কপালের ঘাম মুছে, জাল গুটিয়ে, বসে পড়ল জেলেরা, অপরাধীর মতো।

পাওয়া গেল না তবে। 'খালডা দ্যাখবেন না একবার?' জিজ্ঞেস

করে একজন। নিতাই দত্ত তাকে ধমক দিয়ে বলল : 'আরে, খালে ঝাঁপাইলে তো এতক্ষণে কুমিরে লইয়া গ্যাছে, খাল দেইখ্যা আর হইবেডা কী ?'

শুনে, সারা শরীর শিউরে ওঠে নীলুর। কুমির ? জন্ম থেকে নীলুরা দেখে আসছে তাদের বারান্দায় ঠেস দেওয়া থাকে একটা কুমিরের মাথার কঙ্কাল। দাদু না কি শিকার করেছিল কবে। নিতাই দত্তের কথা শুনে, বিকট সেই শাদা হাড়ের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল নীলু।

একটা বেজে গেছে তখন। ভিড় একটু একটু করে হালকা হয়ে গেছে। থানার দারোগা এসে বলে গেছেন, সব জায়গায় খবর পাঠানো হয়েছে, বেঁচে থাকলে নিশ্চয় তাকে পৌঁছে দেবেন ঘরে, যেন কোনো ভাবনা না করে দাদু। 'আহা রে, এই বয়েসে এই শোক' বলে সান্ত্বনার কথা বলে যায় কজন। হারুন কখন নিঃশব্দে সরে গেছে নীলুর পাশ থেকে। চুপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় নীলু, উঠে যায় তার চিলেকোঠায়, শুয়ে পড়ে বিছিয়ে-রাখা পাটির ওপর।

খড়বাঁধানো সেই সরস্বতীটা মনে পড়ে শুধু। সরস্বতী, না কি লক্ষ্মী ? বোঝা গেল না ঠিক। আর কদিন পরেই তো লক্ষ্মীপুজো তাদের। লক্ষ্মীপুজোর আলপনায় ভরে যাবে ঘর (ফুলমামিও কত-না আলপনা দিয়েছে একসময়ে !), আবজানো দরজায় ঠেস-দেওয়ানো কলাবৌ দাঁড়িয়ে থাকবে নক্‌শা-করা পিঁড়ির ওপর, সে-ই হলো তাদের লক্ষ্মী। আর সিঁড়ি বেয়ে বারান্দা দিয়ে ঘরের ভিতর ওই পিঁড়ি পর্যন্ত এঁকে দেওয়া থাকবে ছোটো ছোটো শাদা শাদা লক্ষ্মীর পা ! নীলুর হঠাৎ যেন বিশ্বাস করতে ভালো লাগল—প্রায় সত্যের মতো মনে হতে লাগল তার—যেন লক্ষ্মীপুজোর দিন ওই পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে ঘরে ফিরে আসছে ফুলমামি, তার নিজের ঘরে। কাল বিকেলের সেই গানটার কথা মনে পড়ল

তার : লক্ষ্মী যখন আসবে। হ্যাঁ, আসবেই তো। ঠিকই তো, হবারই তো কথা। মনে নেই? সেই-যে অনেকদিন আগে—সে খুব ছোটো ছিল তখন—একবার স্নান করে ভিজে গায়ে ভিজে পায়ে ফুলমামি উঠে আসছিল ওই সিঁড়ি দিয়ে ঘরে, পিছনে পিছনে উঠছিল নীলু, আর সিঁড়ির ওপর তার ছোটো ছোটো পায়ের জলছাপ দেখে বলে উঠেছিল মাকে : 'দেখো মা দেখো, লক্ষ্মীপুজো যেন, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ!' হেসে উঠেছিল সবাই।

সেই পায়ের চিহ্ন ধরে কি ফিরবে না আবার, ফুলমামি? কোনো-একদিন সকালবেলায়? ছোঁবে না তার পুতুল?

'সকালবেলার কোন্ পাখি যে / উড়তে আমায় ডাকল নিজে!' ফুলমামির কবিতা থেকে এই লাইনদুটো মনে পড়ল নীলুর। তবে তো সে জানতই! তাকে তো ফুলমামি তবে বলেইছিল সব! কেন সে কিছু বোঝেনি তবে?

ভাবতে ভাবতে এই অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ল নীলু।

১২

আজ দ্বাদশী। আজ নীলুদের চলে যাবার দিন। সকাল থেকে চিলে-কোঠাতেই চুপ করে শুয়ে আছে সে। অত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল কাল, বোঝাই গেল না কিছু, নিঝুম হয়ে আছে বাড়িসুদ্ধ লোক।

জানলা দিয়ে চোখ মেলে দিলে দেখা যায় দূরের সেই ছ-আনি বাড়ি, আর ডাইনে তাকালে কাছারিঘরের পিছন দিয়ে সুপুরিগাছের সারি। জানলার ঠিক পাশেই পুতুল আর খাতায় ভরা বেতের সেই ঝুড়িটা আছে পড়ে। কবিতার খাতা নয়, ঝুড়ি থেকে নীলু তুলে নেয় শুধু পুতুলটাকে। হাত বুলোতে বুলোতে ভাবে, আচ্ছা, এটাকে তো খুব ভালোবাসত ফুলমামি, তাহলে নিয়ে গেল না কেন একে ?

কোথায় গেল ফুলমামি ? নীলুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার হারিয়ে-যাওয়া বন্ধু কেশবের কথা, মনে পড়ে দূরে-চলে-যাওয়া বাসুদির কথা। সবাই কেন শুধু সরে সরে যায় ?

আকাশটা খুব পরিষ্কার, ঝল্‌মল্ করছে একেবারে। তাদের বাড়ির এসব খবর তো আকাশটা আর জানে না কিছু!

নিচের থেকে মায়ের ডাক শুনে পায়ে পায়ে নেমে আসে নীলু। মধ্যের ঘরে ঢুকে দেখে মায়ের সামনে খাটের ওপর বসে আছেন ছিপ-ছিপে একজন মানুষ, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল, মুখটা খুব রোগা, চোয়ালদুটো উঁচু হয়ে জেগে আছে, শুধু চক্‌চক্ করছে দুটো চোখ।

নীলুকে দেখে বললেন : 'এই তোর সেই ছেলে? এত বড়ো হয়ে গেছে?'

চোখের ইশারায় নীলুকে কাছে যেতে বলছে মা, একটু অনিচ্ছে নিয়ে এগোয় নীলু। মা বলল : 'বিশুমামা। প্রণাম করো।'

ওঃ, এত মামাও আছে তার! কে যে বিশুমামা তার কিছুই জানে না সে। বোধহয় সেই লোক, বেনেবাড়িতে সেদিন যার কথা বলেছিল নিতাই দত্ত। মায়ের কথামতো তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই উনি হাত ধরে টেনে নেন কাছে। বলেন : 'না না, প্রণাম না প্রণাম না, পায়ে হাত দিতে নেই মামু। বোসো এইখানে।' মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন : 'জীবনে যাকে দেখলই না কখনো, জানলই না কিছু, হঠাৎ তার পায়ে হাত দেবার কোনো মানে হয়? কী বলো মামু?'

'দেখল না কী, দেখেছে তো।'

'কী? কী দেখেছে?'

'তোমাকে তো দেখেছে ও একবার। অবশ্য সে অনেকদিন আগে।'

'আমাকে? কোথায় দেখবে আমাকে? আমি তো মনে করতে পারি না ওকে দেখার কথা। স্মৃতি কি এত নষ্ট হয়ে গেল না কি আমার? হতেও পারে, যে-মার মেরেছে জেলে!'

'স্মৃতি কিছু নষ্ট হয়নি। তুমি ওকে দেখোনি তা ঠিক। কিন্তু ও তোমাকে দেখেছে।'

নীলু অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাঃ, সে আবার কবে দেখল? কিছু তো মনে পড়ে না তার!

মা বলতে লাগল : 'তোমার দেখার কথা না বিশুদা। কিন্তু আমরা তো দেখেছিলাম। দেখেছে নীলুও। বুঝতে পারেনি হয়তো। তুমি যখন ধরা পড়ো সেবার, স্টিমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েও পালাতে পারোনি যেবার, সেই-যে একতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে সারেঙের

ঘরের দিকে দৌড়োচ্ছিলে তুমি, পিছনে পিছনে ছুটছিল পুলিশ, সে-ছবি তো দুচোখ ভরেই দেখেছিলাম সবাই, দেখেছিল নীলুও। মনে আছে, নীলু? সেই ঝুপ্ করে জলে ঝাঁপানোর শব্দ, আমার বুকের মধ্যে কী কাঁপুনি, স্টিমারসুদ্ধ সবাই ভাবছে ডাকাত, আমি তো ওই চোখদুটো দেখেই চিনে নিয়েছি এক লহমায়—'

মা বলে যাচ্ছে, আর নীলুর আবছা আবছা মনে পড়ে যাচ্ছে কতদিন আগেকার সেই ভোরবেলাকার ছবি। এই না কি সেই লোক? এই? তার তো ছিল একমুখ দাড়ি। মনে পড়ে, মা বলেছিল সেদিন, দেশের কাজ করে তো, দেশকে ভালোবাসে, তাই পিছু নিয়েছে ইংরেজের পুলিশ। এঁরই পিছু নিয়েছিল সেদিন? অতগুলি লোক? এঁর?

মা বলল: 'রোগা হয়ে গেছ খুব। কষ্ট দিত, না? তবু রক্ষে, ছেড়েছে তো! আর, যার জন্য এত কিছু, সেটা তো হলো শেষ অব্দি। হলো তো দেশ স্বাধীন।'

বিশুমামা ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসলেন। বললেন: 'হ্যাঁ, হলো। কিন্তু খুকি, এরই জন্য কি এতদিন ধরে লড়লাম আমরা? এই ভাঙা দেশের জন্য? এই দেশভাঙার জন্য? তোর মনে আছে? আমার যখন তোর-ওই-নীলুর মতো বয়েস, বলেছিলাম একদিন, এই গ্রামটা একসময়ে আমাদের দেশ হবে, সত্যিকারের আমাদের। শুনে তোর খুব অবাক লেগেছিল সেদিন। বলেছিলি, হবে আবার কী, হয়েই তো আছে। ছোটো ছিলাম তো, ঠিক বোঝাতে পারিনি কী বলতে চেয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু আজ কি বুঝতে পারিস? শুনেছি, এই-যে তোরা যাচ্ছিস আজ, আর না কি ফিরবি না এ-দেশে। এ-বাড়ি উঠিয়ে নেবারও কথা হচ্ছে শুনি। হবেই-বা না কেন? গাঁ-সুদ্ধ পুরোনো মানুষেরা সবাই তো চলে গেল, যাচ্ছে একে একে। তারপর? গ্রাম কি তবে হয়েই আছে আমাদের? কোথায় আমার গ্রাম? আমার দেশ?'

নীলুর বুকের মধ্যে কেমন ধুক্‌পুক্ করতে লাগল। মার দিকে তাকিয়ে দেখল, চোখ দিয়ে গড়িয়ে নামছে জল, তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। বিশুমামার আরেকটু কাছ ঘেঁষে বসল সে, মনে হলো একটা কিছু বলার কথা আছে তার, কিন্তু খুঁজে পেল না কী সেই কথা।

একটু পরে, চোখ মুছে, জিজ্ঞেস করল মা : 'তুমি কী করবে এখন? থাকবে তো এইখানেই?'

'আমাদের কি আর সে-ভাগ্য আছে?' বললেন বিশুমামা : 'না, আমার থাকা হবে না।'

'কেন? কোথায় যাবে তুমি?'

'ঠিক নেই কিছু। কিন্তু আমাদের কাজ তো ফুরোয়নি এখনো। বলা যায় না, আবার হয়তো শুরু হবে লুকোচুরি খেলা!'

একটা শ্বাস ফেলে মা বলে : 'আবার?'

ঘরে ঢুকল সেজোমামা। বিশুমামাকে দেখে বলল : 'ও, বিশুদা, তুমি? শুনেছ তো সব কথা?'

'কী কথা? প্রমীলার?'

'হ্যাঁ, প্রমীলার। বলো দেখি কী করি এখন। সারাদিন সারারাত কাল হন্যে হয়ে ঘুরলাম। এখন কী করি!'

'ওভাবে তো হয় না' শান্ত গলায় বিশুমামা বলেন : 'যা করবার, করা তো হয়েছে সবই। থানাগুলিতে খবর দেওয়া হয়েছে। এখন একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া কী আর করতে পারিস বল্!'

শুনে, খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সেজোমামা।

রওনা হতে হবে তিনটেয়, ঘাটে নৌকো বাঁধা। আবারও সেই রহমতেরই নৌকো। আর বছরে এমনি দিনে দালান থেকে ঘাট পর্যন্ত কেবলই নীলু যাওয়া-আসা করছিল ঝুম্পু আলো রঞ্জুদা সোনাদিদের সঙ্গে, জিনিস-

পত্র গুছিয়ে রাখার খেলা-খেলা কাজে। এবার যেন তেমন কোনো তাড়া নেই, ফিরে যাওয়ার সাড়া নেই। যাবার সময়ে যাদের সঙ্গে কথা বলবে, যেন কোথাও, কোথাও যেন তারা নেই। পায়ে পায়ে নীলু হেঁটে বেড়ায় এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এই পুবের ঘর পশ্চিমের ঘর, চিলেকোঠা ছাদ। এ কি হতে পারে যে এখানে আর কোনোদিন পা পড়বে না তার, তাদের? কোনোদিন?

যাত্রা করবার জন্য আসন বিছানো আছে মধ্যের ঘরে। মা বড়োমামি রান্নাঘর থেকে ফেরেনি এখনো। মাথা নিচু করে উঠোনের ওপর একমনে পায়চারি করে চলেছে বড়োমামা। দাদু তার নিজের ঘরে বসে কী যেন লিখে চলেছে হিসেবের লম্বা খাতাটায়। দিদিমা একবার একটা ঘট এনে রাখছে আসনের সামনে, একবার একটা জলভরা কলস। আর মাঝে মাঝে বলছে: 'আয় রে তোরা, যাত্রা করে নে। দেরি করিস না আর।' আর সেজোমামা একটা ঝুলিভর্তি গন্ধলেবু নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলছে: 'বড়োবোঠানের তো আবার নৌকোর দুলুনি সহ্য হয় না, লেবু-গুলি থাকুক সঙ্গে—'

বড়োমামা একবার দাদুর ঘরে ঢুকে নিচুগলায় বলে: 'আমাদের তো সময় হলো।'

তাকিয়ে একবার দেখল দাদু। কথা বলল না কিছু।

অল্প একটু চুপ থেকে আবার বলল বড়োমামা: 'আরেকবার কি ভাববেন? পালটায় তো সবই। নিজেদের তো সেইভাবে পালটে নিতেই হয়?'

আরো একবার চোখ তুলে তাকায় দাদু। বলে না কিছু। তারপর আবার মন দেয় লাল মলাটের সেই লম্বা খাতায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর সেজোমামা বলে: 'ভাববার কিছু নেই। মা-বাবাকে নিয়ে যাব আমি, কদিন পর। আগে একটু গুছিয়ে

তুলি সব !'

বাইরে থেকে হাঁক দেয় রহমত : 'তাড়াতাড়ি করেন কত্তারা, জোয়ারের কিন্তু সময় হইল।'

সেজোমামা তাকে তাড়া দিয়ে বলে : 'আরে যা তুই, খেয়াল আছে আমাদের—'

দিদিমা ডাকে সবাইকে : 'কই, এসো সবাই। নাও, যাত্রা করে নাও। লগ্ন হয়েছে।'

ছোটো থেকে বড়ো ? না বড়ো থেকে ছোটো ? দিদিমা বলে : 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোটো থেকে বড়ো। বোস্ তুই আগে।'

বসে পড়ে নীলু আসনে। যাত্রা করা কাজটা কিছু শক্ত না। ওই আসনে বসে বড়োদের প্রণাম করতে হবে একে একে, ধান দুর্বো মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করবেন তাঁরা। তারপর আমের পল্লব বসানো সিঁদুর মাখানো ঘটের কাছে মাটিতে মাথা রেখে মনে মনে চাইতে হবে বিদায়, আর তারপর সেই কলসের টল্‌টলে জলে নিজের মুখের ছায়া দেখতে হবে নিচু হয়ে, মনে মনে বলতে হবে 'আবার আসব', তারপর উঠে, পিছন দিকে একবারও আর না তাকিয়ে, বেরিয়ে যেতে হবে একেবারে ঘরের বাইরে।

'আবার আসব'—মনে মনে বলতে গিয়েও কথাটা আটকে গেল নীলুর গলায়। সত্যি তো নয় সেটা। ঠিক হবে কি বলা ?

একে একে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে মা বড়োমামি বড়োমামা। সবাই মিলে এগোতে থাকে উত্তরমুখে খালের দিকে, সঙ্গে সেজোমামা ধরে ধরে নিয়ে চলে দিদিমাকে। ধরতে হচ্ছে, কেননা এতক্ষণ কোনো-রকম কষ্টের কথা না বলে এই একেবারে শেষবেলায় ডুকরে কেঁদে উঠেছে দিদিমা, সেদিকে আর তাকাতে পারে না কেউ। কারো দিকেই কেউ

তাকায় না। একবার শুধু পিছন ফিরে নীলু দেখল, তাদের থেকে অনেকটা দূরে পিছনে পিছনে এগিয়ে আসছে দাদু, ধুতির খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে।

জোয়ার আসার একটা মিষ্টি কুল-কুল আওয়াজ শোনা যায় খালে, কান পেতে থাকলে। সেই শব্দটা শুনতে শুনতে, কাদার ওপরে বিছানো পাটাতনের ওপর দিয়ে নৌকোয় উঠে বসে নীলু, ওখানে বসে ভালো করে একবার পা ধুয়ে নেয় জলে। উঠতে থাকে সবাই। এতক্ষণে চোখ মুছে নিয়েছে দিদিমা। ভেজা গলায় বলে: 'নারকেলের পুঁটুলিটা নিয়েছিলি তো মনে করে? সুপুরিগুলি?'

দাদু একবার বলে মাঝিকে: 'দেরি যেন বেশি না হয় দেখিস। আর ফিরবার পর খবর দিস একটা।'

কাদার মধ্যে লগি ঠেলতে ঠেলতে রহমত বলে: 'কিচ্ছু ভাইব্‌বেন না কত্তা, ভয়ের কিচ্ছু নাই। রহমত তো রইলই লগে।'

পাড় থেকে অল্প অল্প সরতে থাকে নৌকো, দুলতে থাকে মচর্ মচর্। নীলু এরই মধ্যে উঠে বসেছে ছইয়ের ওপর। গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বড়োমামা, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসে আছে মা আর বড়োমামি। এবার পশ্চিমমুখে সরতে শুরু করেছে নৌকো, লগি ছেড়ে রহমত এবার হাল ধরে বসে, বৈঠা বাইতে শুরু করে ইয়াকুব ইয়াসিন।

সেজোমামা হাঁক দিয়ে বলে: 'নীলাই, পরের পুজোয় কিন্তু "বিসর্জন"টা করব কলকাতায়, পার্ট যেন মুখস্থ থাকে।'

অল্প একটু হেসে নীলুও বলে চেঁচিয়ে: 'সেই বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বাড়িতে।'

চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে কাছারিঘর, মণ্ডপ, দালানঘরের ছায়া। ওদের কি আমি প্রণাম করেছিলাম? আসবার সময়ে? ভাবে একবার নীলু। ওই-যে একদিন গাছের তলায় ভিজে মাটির ওপর উপুড়

শুয়ে শুয়ে ছিল নীলু, মনে হয়েছিল যেন সমস্তটাকে পেয়ে গেছে একে-বারে বুকের মাঝখানে, সেইরকমই একবার লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করবার ইচ্ছে হলো তার। প্রণাম তোমায় মাটি। প্রণাম ওই একলা-কোণে স্থল-পদ্মের গাছটাকে। প্রণাম ওই পুকুরের পিছল ঘাটকে। প্রণাম ওই খাল-পাড়ের অনেকদিনের পড়ে-থাকা ভাঙা নৌকোকে। এই তো ছ-আনি বাড়ির ঘাট দিয়ে এগিয়ে চলেছে নৌকো, আরেকটু পেরোলেই ঘোষের বাড়ি বড়োবাড়ি সব-উত্তরের বাড়ি, আরেকটু পেরোলেই লাইব্রেরি, আর তারপরেই তো হাটখোলার কোণ। প্রণাম মাটি, প্রণাম সাঁকো, প্রণাম ঢাক কাঁসর। টিনের চালা, নিকোনো উঠোন, হাটখোলা, প্রণাম।

এইবার বাঁ দিকে বাঁক নিতে হবে, খাল ছেড়ে এবার নদীতে পড়বে নৌকো। বাঁক নেবার মুখে, হাটখোলার কোণে, উলটে-রাখা প্রকাণ্ড এক মাটির জালার ওপর বসে বসে সবুজ একটা রুমাল ওড়াচ্ছে, কে? কে ওটা? চমকে উঠে নীলু দেখে, হারুন! ওই তো ওইখানে এসে বসে আছে হারুন। চিৎকার করে বলে ওঠে হারুন: 'এই-যে আমি, নীলাই। এই-যে রে! আসিস কিন্তু আবার, সামনের বার। আসবি তো? কী রে, আসবি তো? আসিস আবার। আসবি?'

জালার থেকে নেমে নদীর পাড়ি ধরে হাঁটতে থাকে হারুন। আর মাঝে মাঝে বলে: 'কী রে, কথা কইস না ক্যান্, আসবি তো?'

উত্তর দেয় না নীলু। যাত্রা করবার সময়ে জলের ছায়ায় নিজের মুখ দেখেও বলেনি তো সে কিছু। উত্তর দেয় না, কিন্তু চলন্ত নৌকোর ছই থেকে নিমেষহারা তাকিয়ে থাকে হারুনের চোখে চোখে। আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসে সেই চোখ, অস্পষ্ট হয়ে যায় হারুন, অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে পিছনে-পড়ে-থাকা তাদের গোটা গ্রামখানা। বড়োমামা বলে: 'ওই দেখ্, শুরু হলো বড়ো সুপুরিবনটা। জানিস তো, ওই পর্যন্তই হলো আমাদের গ্রামের সীমা। ব্যস্, তারপর, শেষ—'

শেষ? হ্যাঁ, শেষ। প্রণাম তোমায়, শেষ। প্রণাম তোমায়, এই দ্বাদশীর বিকেল। প্রণাম, ওই খালের মুখে নদীর জলের ঢেউ। প্রণাম তোমায় তুলসীতলা, মঠ। প্রণাম ফুলমামি। প্রণাম, তবে প্রণাম তোমায় সুপুরিবনের সারি।

মনে মনে বলতে চায় নীলু: হারুন, আসব আবার। কিন্তু বলতে পারে না কিছু। আবার একবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে, নৌকো শুধু চলতে থাকে মচর মচর, ঢিমে তালে, একটানা পশ্চিমের দিকে।

—